শ্রেণী
শ্রেণী সংগ্রাম
রাষ্ট্র ও বিপ্লব

পার্থ ঘোষ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

প্রকাশক
সুনীল বসু
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর
দুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীগণেশ বসু

সূচী

১

শ্রেণী বলতে কি বুঝায় ?

শ্রেণীসংগ্রামই ইতিহাসের চালিকাশক্তি; মার্কস-এঙ্গেলস এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন। সে-শিক্ষা কোন সময়েই ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলসের এই শিক্ষার তাৎপর্য কি, গুরুত্ব কি তা আমাদের ভালো করে বুঝা দরকার। তা বুঝতে হলে শ্রেণী এবং শ্রেণীসংগ্রাম বলতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রযোজন। আমাদের চোখের সামনেই আমরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করছি আর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামও দেখছি। কিন্তু এই শ্রেণী সম্বন্ধে মূল কথাটা কি তা আমাদের জানা দরকার—শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনার জন্যই এটা আমাদের জানা প্রয়োজন।

আমরা যে সমাজে বাস করছি সে সমাজে বিভিন্ন পেশার লোক আমরা দেখছি। আমরা দেখছি কলকারখানার মালিকদের, জমির মালিকদের আর কলকারখানায় যারা কাজ করে সেই মজুরদের এবং ক্ষেতে খামারে যারা কাজ করে সেই কৃষকদের। এ ছাড়া আরও দেখছি অফিসে যারা কাজ করে সেই কর্মচারীদের। এরা সবাই ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত চলছে, সে সংঘাত সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করছে। বিকশিত হয়ে উঠছে শ্রেণী সংগ্রাম। শ্রেণী, শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্ব, শ্রেণীসংগ্রাম—এ সব নিয়েই বিরাজ করছে আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা।

কিন্তু শ্রেণী বলতে আমরা কি বুঝি? রুশ যুব কমিউনিস্ট-লীগের তৃতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে [১৯২০ সালের ২রা অক্টোবর] লেনিন এই প্রশ্নের জবাব এইভাবে দিয়েছিলেন: "সাধারণভাবে শ্রেণী বলতে আমরা কি বুঝি? শ্রেণী অর্থে বোঝায় এমন ব্যবস্থা যার ফলে সমাজের একটি অংশ আরেকটি অংশের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে। যদি সমাজের একটি অংশ সমস্ত জমি আত্মসাৎ করে নেয় আমরা পাই জমিদার ও কৃষক শ্রেণীকে। যদি সমাজের একটি অংশ সমস্ত কলকারখানা ও শেয়ার, পুঁজির অধিকারী হয় এবং অন্য অংশ তাদের জন্য খাটে তাহলে আমরা পাই পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীকে।"

উৎপাদনের উপায় সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে শ্রেণীর উৎসের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। বর্তমানে সমাজ বিকাশের ধারায় উৎপাদন যে-স্তরে

এসে পৌঁছেছে তাতে উৎপাদন করতে গেলেই প্রয়োজন হয় জমি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল। এগুলিকে বলা হয়ে থাকে উৎপাদনের উপায় সমূহ। আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, উৎপাদনের উপায় সমূহ হচ্ছে "জমি, বন, জল, খনিজ সম্পদ, কাঁচামাল, উৎপাদনের যন্ত্র, উৎপাদনের স্থান, চলাচল ও যানবাহনের ব্যবস্থা।"

কিন্তু মানুষের শ্রম ছাড়া, জীবন্ত শ্রমশক্তি ছাড়া উৎপাদনের উপায় সমূহ ফলহীন। উৎপাদনের উপায় সমূহের মধ্যে উৎপাদন যন্ত্র বলে যা আছে তা হচ্ছে পূর্বেকার শ্রমের ফলে অর্জিত বস্তু, আরো সংক্ষেপে তা হচ্ছে সঞ্চিত শ্রম। উৎপাদনের উপায় সমূহে যখন শ্রমশক্তি প্রয়োগ করা হয় তখনই শুরু হয় উৎপাদনের প্রক্রিয়া। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অর্থাৎ ধনতন্ত্রী সমাজে পুঁজিপতিদের উৎপাদন শুরু করবার জন্য প্রয়োজন হয় কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, আবার যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, তৈল, জ্বালানি, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি। কিন্তু এ সবই হচ্ছে উৎপাদনের প্রস্তুতিপর্ব। পুঁজিপতিদের যখন উৎপাদন শুরু করতে হবে তখন তাদের সংগ্রহ করতে হবে মজুরদের এবং কলকারখানার মজুরদের কাজে লাগাতে হবে—এ না হলে উৎপাদন শুরু হতে পারে না। উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকানা যাদের হাতে তারা সমাজের একটা শ্রেণী সাধারণ কথায় যাদের বলা হয়ে থাকে উপর তলার শ্রেণী। এরাই হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী যাদের বলা হয় বুর্জোয়া শ্রেণী। আর উৎপাদনের উপায় সমূহের কাজে যাদের নিয়োগ করা হয় তারা হচ্ছে আর একটা শ্রেণী। সাধারণ কথায় যাদের বলা হয়ে থাকে নীচের তলার শ্রেণী। এরাই হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী যাদের বলা হয়ে থাকে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী।

আসলে উৎপাদনের উপায় সমূহের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে নির্ধারিত হয় শ্রেণীর অবস্থান। উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিক কারা ? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত রয়েছে সমাজের মূল শ্রেণী বিন্যাস। যেমন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জমিই হচ্ছে প্রধান উৎপাদনের উপায়। এই জমির যারা মালিক তারা হচ্ছে জমিদার শ্রেণী। এই জমিকে ফলপ্রসূ করার জন্য যাদের কাজে লাগানো হয় তারা হচ্ছে কৃষক শ্রেণী। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার দৌলতে জমিদারেরা এই কৃষকদের শোষণ করে। জমিদারেরা হচ্ছে শোষক শ্রেণী আর কৃষকেরা হচ্ছে শোষিত শ্রেণী। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায় সমূহের উপর ধনিকদের, পুঁজিপতিদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত, তাদেরই হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপাদান। আর যারা এই উৎপাদনের উপায় সমূহ ফলপ্রসূ করার কাজে নিযুক্ত সেই শ্রমিকেরা নিঃস্ব, তাদের হাতে উৎপাদনের উপায় সমূহের কোন কিছুই নেই। পুঁজিপতিরা এদের শোষণ করে। উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থেকে

বঞ্চিত বলেই অনাহারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শ্রমিকেরা মজুরির বিনিময়ে পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে এবং শোষণের বন্ধন মেনে নিতে বাধ্য হয়। এখানে পুঁজিপতিরা হলো শোষক শ্রেণী, আর শ্রমিকেরা হচ্ছে শোষিত শ্রেণী।

সমাজজীবনের প্রধান ও নির্ধারক বিষয়টি হলো বৈষয়িক উৎপাদন। তাই সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় জনসাধারণের এক একটা বিশেষ গ্রুপ কি স্থান অধিকার করে রয়েছে, উৎপাদনের উপায় সমূহের সংগে তাদের সম্পর্ক কি—এরই মধ্যে খুঁজতে হবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার ভিত্তিটা।

লেনিন তাঁর 'বৃহৎ উদ্যোগ' (এ গ্রেট বিগিনিং) শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রেণীর একটি পূর্ণাংগ সংজ্ঞা দিয়েছেন। সেই সংজ্ঞাটা আমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার। তিনি লিখেছেন : "শ্রেণীগুলি হলো এমন কতকগুলি বৃহৎ জনসমষ্টি যাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা নির্ভর করে ঐতিহাসিক ধারায় নির্ধারিত একটি সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের স্থান অনুযায়ী, উৎপাদনের উপায় সমূহের সংগে তাদের সম্পর্ক অনুযায়ী (অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সম্পর্ক আইনের দ্বারা স্থির ও সূত্রবদ্ধ), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা অনুযায়ী এবং এর ফলস্বরূপ সমাজের যে সম্পদ তারা সৃষ্টি করে তার অংশের মাত্রা এবং সেই অংশ অর্জনের পদ্ধতির দ্বারা। শ্রেণীগুলি হলো জনসাধারণের কতকগুলি গ্রুপ যার কোন একটি নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের পারস্পরিক অবস্থানের পার্থক্যের দরুন অপর গ্রুপগুলির শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে।"

কিন্তু শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটলো কখন এবং তার পূর্বে কি ধরনের সমাজ ছিল ?

মার্কস-এংগেলস রচিত "কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো"র প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভেই লেখা রয়েছে : "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস হলো শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।"

এই ইতিহাস বলতে তখন (১৮৪৭-৪৮) সমগ্র লিখিত ইতিহাস বুঝাতো। পরে যখন মর্গানের চূড়ান্ত আবিষ্কারের ফলে আদিম কমিউনিস্ট ধরনের সমাজের অর্থাৎ জমির উপর যৌথ মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতীয় সমাজের ভিতরকার সংগঠনের বিশিষ্ট রূপটি উন্মুক্ত হলো, তখন দেখা গেল সে সমাজে শ্রেণী বলে কিছু নেই।

এই আদিম কমিউনিস্ট ধরনের সমাজকেই আদিম যৌথ সমাজ বলা হয়ে থাকে। এই আদিম যৌথ সমাজের অস্তিত্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব মর্গানের। এংগেলস তার "পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" গ্রন্থের ১৮৮৪ সালের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেন : "মর্গানের মহৎ কৃতিত্ব হচ্ছে

এই যে, তিনি আমাদের লিখিত ইতিহাসের এই প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার করেন এবং উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের কৌলিক গোষ্ঠীর মধ্যে গ্রীক, রোমক ও জার্মান ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এতদিন পর্যন্ত দুর্বোধ্য ধাঁধার চাবিকাঠি খুঁজে পান।"

এই আদিম যৌথ সমাজকে বাদ দিয়েই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর উপরে উল্লেখিত ঐ বক্তব্য—"আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে, তাদের সকলের ইতিহাস হলো শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস"—বুঝতে হবে।

মার্কসের মৃত্যুর পর—"কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর" ১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকার এক জায়গায় এংগেলস লিখলেন: "...মানব জাতির সমগ্র ইতিহাস (জমির উপর যৌথ মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতীয় সমাজের অবসানের পর থেকে) হলো শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস, শোষক ও শোষিত, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস।"

এই আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থার যে সব প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তা হলো:

(১) সমাজের প্রত্যেককেই কাজ করতে হতো; কাজ না করলে তাদের অনাহারে মরতে হতো। এ সমাজে ধনী বা গরিব বলে কেউ ছিল না। ছিল না কোনো শ্রেণী বিভাগ ও শোষণ বলেও কিছু ছিল না।

(২) এই সমাজে উৎপাদনের উপকরণের (বা উপায় সমূহের) উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণার উদ্ভব হয়নি; উৎপাদনের উপকরণের উপর ছিল সমাজের মালিকানা।

(৩) এই সমাজে শ্রেণী বলে কিছুই ছিল না, তাই শোষণ বলেও কিছু ছিল না।

(৪) তাই এই সমাজে রাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না, এই সমাজ ছিল শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজ।

এই আদিম যৌথ সমাজের বিকাশধারায় যখন এর অবসানের অবস্থার উদ্ভব হলো তখনই দেখা দিল শ্রেণীর আবির্ভাব।

২

শ্রেণীর আবির্ভাব

আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে স্তালিন "সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস"-এর এক জায়গায় বলেছেন: "আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল এই যে, উৎপাদনের উপকরণগুলি

(বা উপায়সমূহ) ছিল সমাজের অধিকারে। সেই যুগের উৎপাদিকা শক্তির প্রকৃতির সঙ্গে এর মোটামুটি সামঞ্জস্য ছিল। পাথরের অস্ত্রাদি ও পরের যুগে তীরধনুকের প্রচলন হলে দেখা গেল যে মানুষের পক্ষে একক চেষ্টায় বন্য জন্তু ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। ফল সংগ্রহ করা, মাছ ধরা, আস্তানা গড়া সব ব্যাপারেই মানুষকে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হতো—নতুবা অনাহারে মৃত্যু বা বন্য জন্তুর বা প্রতিবেশী কোনো শত্রুর কবলে পড়াই ছিল অবশ্যম্ভাবী। একত্র পরিশ্রম করার ফলে যারা কাজ করতো তারা সকলে মিলে হলো উৎপাদনের উপকরণের (বা উপায়সমূহের) ও উৎপন্ন দ্রব্যেরও মালিক। তখন সমাজের উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা আসেনি। শুধু প্রত্যেকেরই কয়েকটি উৎপাদনের হাতিয়ার থাকতো যা তাঁর নিজস্ব, কিন্তু সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র পশুর বিরুদ্ধে নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হতো। এ সমাজে শ্রেণী বিভাগও ছিল না, শ্রেণীগত শোষণও ছিল না।"

স্তালিনের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট একটা ছবি ফুটে উঠেছে। এই আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার পরই দেখা দিল দাস সমাজব্যবস্থা। এই দাস সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন হলো শ্রেণীর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।

আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থায় মানুষকে প্রথমদিকে সংগ্রাম করতে হতো প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই মানুষ শিখলো কিভাবে আগুন জ্বালাতে হয়, কিভাবে তীরধনুক বানাতে হয় এবং বন্য জন্তু শিকারের জন্য তীরধনুক ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে ভুট্টা, বার্লি, গম প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী জন্মাতে হয়; কিভাবে পশু পালন করতে হয় তাও মানুষ শিখলো।

এ সব ঘটতে হাজার হাজার বছর লেগেছে এবং এগুলি ধীরে ধীরে ঘটেছে। যে জিনিসটা লক্ষ্য করবার সেটি হলো এই যে মানুষ অনড় হয়ে এক জায়গায় বসে থাকেনি। এক বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ চলেছে। কিন্তু মানুষ চলেছে কোথায় এবং কোন পথে? মানুষ চলেছে বর্বর অবস্থা থেকে সভ্যতার পথে, অগ্রগতির পথে। বন্য অবস্থা থেকে মানুষ অগ্রসর হয়েছে বর্বর অবস্থার যুগে এবং সেখান থেকে সভ্যতার যুগে। মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থার এই পর্ব বিভাগই করেছিলেন মর্গান। এঙ্গেলস মর্গানের মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থার এই পর্ববিভাগ সম্বন্ধে লিখেছেন: "আমরা মর্গানের পর্ব বিভাগকে সাধারণভাবে এরূপে ব্যক্ত করতে পারি: (১) বন্য অবস্থা—এ পর্বে অবিলম্বে ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির আহরণই প্রধান ছিল, মানুষের তৈরী জিনিস বলতেঃ মূলত ছিল সে-আহরণে সাহায্য করার মতো হাতিয়ার। (২) বর্বর অবস্থা—এ পর্বে গো-পালন ও কৃষির প্রচলন হয় এবং মানুষের ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির

উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার পদ্ধতিগুলি আয়ত্তে আসে। (৩) সভ্যতা—এই পর্বে প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আরো উন্নততর প্রক্রিয়া এবং যথার্থ শ্রমশিল্প ও কলার জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।"

প্রথমে মানুষ ছিল শুধু খাদ্য সংগ্রহকারী। ধীরে ধীরে আগুনের ব্যবহার, তীরধনুকের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল পশুপালন, কৃষিকার্য ও গার্হস্থ্য শিল্প। মানুষ শিখলো কিভাবে কাপড় বুনতে হয়, কিভাবে মাটির পাত্র, ইঁট তৈরী করতে হয়, কিভাবে রুটি সেঁকতে হয়, কিভাবে খাদ্য উৎপাদন করতে হয় এবং মজুত করে রাখতে হয়। মানুষ শিখলো কিভাবে কাঠের জিনিস তৈরী করতে হয়, কিভাবে তামা গলাতে হয়, ঢালাই করতে হয় এবং তামার হাতিয়ার ও পাত্র তৈরী করতে হয়। তারপর একটা সময় এলো যখন মানুষ তামা ও টিনের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরী করতে শিখলো, আর শিখলো ব্রোঞ্জ দিয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, পাত্র ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে। এর অনেক পরে মানুষ লোহা গলাতে ও ঢালাই করতে শিখলো এবং লোহা দিয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, পাত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করতে শিখলো।

এভাবে মানুষ খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে রূপান্তরিত হলো খাদ্য উৎপাদন-কারীতে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করলো এবং এ কাজের মধ্য দিয়ে সে নিজেকেও শিক্ষিত করে তুললো। প্রস্তর যুগের অসহায়, অজ্ঞ অবস্থা, বর্বর অবস্থা আর মানুষের থাকলো না। আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থার বিকাশের এটি হলো একটি দিক, আরও একটি দিক রয়েছে। সে দিকটি হলো শ্রমের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার ফল এবং এটাই সমাজে নব বিকাশের সূত্রপাত করলো। আগে একটা সমগ্র উপজাতির বা গোষ্ঠীর উৎপাদন ক্ষমতা সমস্ত উৎপাদকের ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটাতে পারতো না। কিন্তু আদিম যৌথ সমাজের বিকাশের একটা স্তরে দেখা গেল যে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে মানুষ উদ্বৃত্ত জিনিসও উৎপন্ন করতে আরম্ভ করলো—যারা কাজ করতো তারা তাদের প্রয়োজন মেটাবার জিনিস তো তৈরী করতোই, এমনকি তারা তারও বেশি জিনিস উৎপন্ন করতো। এই উদ্বৃত্ত জিনিসই সমাজে প্রথম নিয়ে এলো বিনিময় প্রথা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রম বিভাগ এবং বিনিময়ের ফলেই উদ্বৃত্ত জিনিস রূপান্তরিত হলো পণ্যে। এই গতিধারার একটা উদাহরণ দিয়ে এঙ্গেলস লিখেছেন: "পশুপালক উপজাতিগুলি সাধারণ বর্বরদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এই হচ্ছে প্রথম বিরাটাকার সামাজিক শ্রমবিভাগ। এই পশুপালক উপজাতিগুলি বাকি বর্বরদের চেয়ে শুধু অধিক পরিমাণে খাদ্যই উৎপাদন করতো না, তারা বেশি বৈচিত্র্যের খাদ্যও তৈরী করতো। অপরদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তাদের শুধু দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী ও মাংসই ছিল না, পরন্তু

ছিল চামড়া, পশম, ছাগলের লোম এবং ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের ফলে অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত তন্তু বস্ত্র। এটাই সর্বপ্রথম নিয়মিত বিনিময় সম্ভব করলো। ......সূচনায় নিজের নিজের গোত্র প্রধানদের মারফত একটি উপজাতি অপর একটির সংগে বিনিময় চালাতো। কিন্তু যখন পশুযূথগুলি স্বতন্ত্র সম্পত্তিতে পরিণত হতে লাগলো তখন থেকে ব্যক্তিদের মধ্যে বিনিময় ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এটাই হয়ে উঠলো একমাত্র ধরন"। (পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি)।

এই উদ্বৃত্ত জিনিস থেকে মানুষের মনে আর একটা ধারণা জন্মালো যে, যদি অন্যকে দিয়ে কাজ করানো যায় তাহলে নিজে কোন কাজ না করে অন্যের শ্রমের ফলে সৃষ্ট ঐ উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর করেই সে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। তা ছাড়া বিনিময় ব্যবস্থা চালু হবার পর এক একটা উপজাতির সমস্ত সদস্যের দৈনিক কাজের পরিমাণও বাড়লো। তাদের দরকার হলো আরও বেশি শ্রমশক্তির। এই শ্রমশক্তির জোগানের জন্য চললো উপজাতি উপজাতিতে যুদ্ধ এবং যুদ্ধবন্দীরাই জোগালো এই শ্রমশক্তি। এই যুদ্ধবন্দীরা হলো ক্রীতদাস। আগে উপজাতিতে উপজাতিতে যুদ্ধ হতো ধাতু দখলের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখন যুদ্ধ হতে লাগলো শুধু ধাতু দখলের উদ্দেশ্যে নয়, নারী পুরুষদের বন্দী করার উদ্দেশ্যে এবং এদের শ্রমশক্তি নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনার জন্য। যুদ্ধে বিজয়ী গোষ্ঠী এই ক্রীতদাসদের দিয়ে কাজ করাতো এবং ধীরে ধীরে এটাই সমাজের উৎপাদন প্রথা হয়ে দাঁড়ালো।

এংগেলসের কথায়ঃ "পশুপালন, কৃষি, গার্হস্থ্য শিল্প—সমস্ত শাখায় উৎপাদনের বৃদ্ধিতে মানুষের শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি জিনিস উৎপাদন করা সম্ভব হলো। ঐ একই সময়ে এতে গোত্র অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী অথবা একক পরিবারের সমস্ত সদস্যের দৈনিক কাজের পরিমাণ বাড়লো। আরো শ্রমশক্তির জোগান বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়লো। এটা জোগালো যুদ্ধঃ যুদ্ধবন্দীদের দাস করা হলো। ঐ বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রম বিভাগ শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে অর্থাৎ সম্পদ বাড়িয়ে এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তার পিছু পিছু অনিবার্যভাবেই দাস প্রথাকে টেনে আনলো। প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রম বিভাগ থেকে এলো দুটি শ্রেণীতে সামাজিক বিভাগ—মালিক ও ক্রীতদাস, শোষক ও শোষিত।" (পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি)।

এ ভাবেই ঘটলো আদিম যৌথ সমাজের দাস সমাজে উত্তরণ আর তার সংগে সংগে সমাজে শ্রেণীর আবির্ভাব ও শোষণের আবির্ভাব।

কিন্তু যুদ্ধ বন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার সংগে সংগে ক্রীতদাসদের

দাবিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, যাতে তারা বিদ্রোহ না করতে পারে এবং পালিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই প্রয়োজনীয়তার দাবি মেটানোর জন্য সৃষ্টি করা হলো সশস্ত্র বাহিনী, আজকে যাকে বলা হয়ে থাকে "পুলিসবাহিনী"। তখন সমাজে দুটো শ্রেণী প্রধান হয়ে দাঁড়ালো—দাস আর দাস-মালিক। এদের মধ্যে সংঘর্ষও দেখা দিল। দাস-মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে দাসরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতো। এখানেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো দুটো শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম। দাসদের কাজ করতে হয় দাস-মালিকদের জন্য। দাস-মালিকেরাই উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক। এই নতুন সমাজকে তখন দুটো উদ্দেশ্যে নিজেকে সংগঠিত করতে হলো ঃ প্রথমতঃ তাকে সংগঠিত করতে হলো বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয়তঃ তাকে সংগঠিত করতে হলো দাসদের উপর দাস-মালিকদের কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য। যে হাতিয়ার বা যে যন্ত্রের সাহায্যে এই নতুন সমাজ নিজেকে সংগঠিত করলো সেটি হলো রাষ্ট্রযন্ত্র। দাস সমাজেই শ্রেণীর আবির্ভাব ও রাষ্ট্রের আবির্ভাব।

লেনিনের কথায় ঃ "এমন একটা সময় ছিল যখন কোন রাষ্ট্র ছিল না। যখন ও যেখানেই সমাজে শ্রেণী বিভাগ দেখা দেয়, যখন শোষক ও শোষিত দেখা দেয় তখনই রাষ্ট্র দেখা দেয়।"......সমাজে "যখন এমন এক বিশেষ ধরনের লোক দেখা দেয় যাদের একমাত্র কাজ হলো শাসন চালানো এবং শাসন চালানোর জন্য যাদের বলপ্রয়োগের ও জোর করে অন্যদের ইচ্ছাকে আয়ত্তে আনার বিশেষ যন্ত্র কারাগার, বিশেষ বাহিনী সৈন্যদল ইত্যাদি দরকার হয়, তখনই রাষ্ট্র দেখা দেয়, ...ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই এবং যেখানেই সমাজে শ্রেণী বিভাগ দেখা দিল অর্থাৎ সমাজ এমন কয়েকটি দলে বিভক্ত হলো যাদের মধ্যে কেউ কেউ চিরকাল অন্যদের শ্রমের ফল হস্তগত করার মতো অবস্থায় থাকে, যেখানে কিছু লোক অন্যদের শোষণ করে, তখনই মানুষের প্রতি বলপ্রয়োগের বিশেষ যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র দেখা দিল"। ("রাষ্ট্র" প্রবন্ধ)।

এভাবেই সমাজে প্রথম শ্রেণী বিভাগ দেখা দিল, দেখা দিল শোষণ, দেখা দিল দাস আর দাস-মালিকদের মধ্যে, অর্থাৎ গরিব আর ধনীর মধ্যে শ্রেণী সংঘর্ষ; দেখা দিল রাষ্ট্র। মানব সমাজের বিকাশের গতিধারায় এই শ্রেণী বিভাগের, শোষণের, শ্রেণী সংঘর্ষের বা শ্রেণী সংগ্রামের ও রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটেছে।

৩

শোষণের আবির্ভাব

শোষণ কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। শোষণের বিভিন্ন রূপ আমরা দেখছি। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের, গ্রামের গরিবদের শোষণ করছে জমিদার-জোতদারেরা, শহরাঞ্চলে, কলকারখানায়, খনিতে শ্রমিকদের শোষণ করছে কল-কারখানার, খনির মালিকেরা অর্থাৎ পুঁজিপতিরা। অফিসে অফিসে কর্মচারী-দের অর্থাৎ মধ্যবিত্তদের শোষণ করছে মালিকেরা। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত—সবাই শোষিত হচ্ছে। এরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, কিন্তু ওরা নিজেদের অভাব অনটন দূর করতে পারে না, নিজেদের জীবিকা নির্বাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারে না—অনাহার, অর্ধাহার, অকাল মৃত্যু এদের জীবনের চিরসাথী। এদের এই অবস্থা কেন? এদের এই অবস্থার কারণটা হলো এই যে, এদের শ্রমের ফল অন্যরা আত্মসাৎ করে নেয়। গায়ের রক্ত জল করে এরা সমাজে যা উৎপন্ন করে তার অধিকাংশই অন্য লোকেরা লুটে নেয়। সমাজে এক শ্রেণীর লোকেরা যখন অপর শ্রেণীগুলির শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে, তাদের মেহনতের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর নিজেদের মালিকানার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে তখনই সেটা শোষণের রূপ ধারণ করে। কিন্তু এই শোষণের উৎসটা কোথায়? এটা নিহিত রয়েছে সমাজের উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার রূপের মধ্যে। অপর শ্রেণীগুলির শ্রমের ফল সমাজের কোন একটি বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক আত্মসাৎ করা হচ্ছে কি না তা নির্ধারিত হয় সমাজের উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার রূপ, সম্পত্তি সম্পর্কের, উৎপাদন সম্পর্কের প্রকৃতি দিয়ে। **উৎপা-দনের উপায়ের মালিকানাটাই হচ্ছে এখানে প্রধান বস্তু।**

আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায় ছিল সমাজের অধিকারে। তখন উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ছিল অত্যন্ত আদিম ধরনের। এবং তারই ফলে দেখা দিয়েছিল উৎপাদনের উপায়ে সমাজের মালিকানা। মানুষের পক্ষে তখন একক চেষ্টায় বন্য জন্তু ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করা সম্ভব হতো না। জীবন-ধারণের জন্য আদিম ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে মানুষকে তখন দলবদ্ধভাবে কাজ করতে হতো এবং একত্রে কাজ করার ফলে উৎপাদনের উপায় ছিল সকলের সাধারণ সম্পত্তি, আর তারা সবাই মিলে ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক। উৎপা-দনের উপায়ের উপর তখন বিশেষ ব্যক্তি বা গ্রুপের অধিকার ছিল না, ঠিক

তেমনি উৎপন্ন দ্রব্যও কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গ্রুপ আত্মসাৎ করতে পারতো না। তাই তখন কোনো শ্রেণী ছিল না, ছিল না কোন শোষণ।

১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর বিপ্লবের পর রুশ দেশে প্রতিষ্ঠিত হলো সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইওরোপের, এশিয়ার কয়েকটি দেশে এবং আমেরিকা মহাদেশের একটি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, সমাজতান্ত্রিক শিবির। এই সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপায় সমাজেরই অধিকারে, সমাজেরই সম্পত্তি। এই সমাজে উৎপাদনের উপায়ের উপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। এখানে উৎপাদনের উপায়ের উপর সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। এখানে উৎপাদনের উপায় কোন ব্যক্তিবিশেষের বা গ্রুপের সম্পত্তি নয়, সমগ্র সমাজই উৎপাদনের উপায়ের মালিক। এখানে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান হয়েছে। এখানে উৎপন্ন দ্রব্য বিলি হয় যে যে-রকম পরিশ্রম করছে সেই ভাবে—এই ব্যবস্থার মূলনীতি হলো এই—"যে কাজ করবে না সে খেতে পাবে না।" এখানে শোষণ নেই সত্য, কিন্তু শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে। প্রলেতারিয়েতের পাশাপাশি পরাজিত বুর্জোয়া শ্রেণী আছে, তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই সমাজতন্ত্রী সমাজেও শ্রেণী বিরোধ আছে, আছে শ্রেণী সংগ্রাম। সমাজতন্ত্রী সমাজ যখন কমিউনিস্ট সমাজের স্তরে পৌঁছবে তখন সেটা হবে শ্রেণীহীন সমাজ যেখানে উৎপাদন পদ্ধতির নীতি হবে "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী নেওয়া এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া।"

আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা—এই দুয়ের মাঝে মানবজাতির ইতিহাসে আর যে যে সমাজব্যবস্থা দেখা দিয়েছে—দাস সমাজ-ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তার প্রত্যেক-টিতেই উৎপাদনের উপায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের বা গ্রুপের, সমাজের মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার মালিকানা। এই তিনটি সমাজব্যবস্থায়ই উৎপা-দনের উপায়ের উপর সমাজের মালিকানা নেই, আছে সংখ্যাল্পের মালিকানা। ফলে যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক তারা সেই মালিকানার অধিকার বলে অন্যের উৎপন্ন দ্রব্য আত্মসাৎ করতে সক্ষম এবং এটাই তারা করে থাকে। তাই এদের পক্ষে অন্যের শ্রমের ফলের উপরই জীবনধারণ করা সম্ভব হয়; অন্য কথায় এরা, উৎপাদনের উপায়ের মালিকরা অন্যদের অর্থাৎ উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত মানুষদের শ্রমের ফল ভোগ করেই জীবনধারণ করে। এটাই হচ্ছে শোষণ। কিন্তু এই ব্যবস্থার উদ্ভব হলো কি করে?

প্রথমতঃ উৎপাদিকা শক্তির (উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে দুটো জিনিস আছে—

একটি হলো উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, আর একটি হলো উৎপাদনে অভিজ্ঞ ও শ্রমকুশল জনগণ। স্তালিনের কথায়ঃ "উৎপাদনের যে যন্ত্রগুলির সাহায্যে বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়, যে জনগণ উৎপাদন অভিজ্ঞতা এবং শ্রম দক্ষতার বলে উৎপাদনের যন্ত্রগুলি ব্যবহার করে এবং বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে— এই সব মিলে সমাজের উৎপাদিকা শক্তি গঠিত হয়।") বিকাশধারায় যখন সমাজে শ্রম বিভাগ দেখা দিল এবং তার বিকাশ ঘটলো তখন এই শ্রমবিভাগই এক একটা গোটা উপজাতির আদিম যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থায় ভাঙ্গন সৃষ্টি করলো এবং সেই ভাঙ্গনের ফলে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা ধীরে ধীরে বিশেষ করে ব্যক্তিবর্গের এবং গ্রুপের হাতে চলে যেতে লাগলো। এর সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল উৎপন্ন দ্রব্য ব্যক্তিগতভাবে দখল করার প্রথা, কেননা যারাই উৎপাদনের উপায়ের মালিক তারাই আত্মসাৎ করলো উৎপন্ন দ্রব্য। পশুযূথ যখন উপজাতির সাধারণ অধিকার থেকে এক একটি পরিবারের প্রধানদের মালিকানায় চলে গেল, যখন চাষের জমি আলাদা আলাদাভাবে এক একটি পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট হলো, যখন কারিগরি শিল্পের আবির্ভাব ঘটলো তখন তার সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যও সর্বসাধারণের সম্পত্তি থাকলো না, তাতে ব্যক্তিগত দখলই কায়েম হলো, দেখা দিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

এই প্রসঙ্গে আরো লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো উৎপন্ন দ্রব্যের পণ্যে রূপান্তর—এই প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করেছে ধনতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যই পণ্যের রূপধারণ করেছে।

কতকগুলি উৎপন্ন দ্রব্যের যখন অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় ঘটে তখনই সেগুলিকে আমরা পণ্য বলি। এই পণ্য হচ্ছে অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময়ের জন্য উৎপন্ন দ্রব্য। পণ্য হলো প্রথমতঃ এমন একটি বস্তু যা দিয়ে মানুষের কোনো একটা চাহিদা মেটে; দ্বিতীয়তঃ এ হলো এমন একটা বস্তু যার সঙ্গে অন্য বস্তুর বিনিময় চলে। উৎপন্ন দ্রব্যের এই পণ্য রূপান্তর সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেনঃ "গবাদি পশুযূথ ও বিলাস দ্রব্য নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় প্রচলিত হলো, উৎপন্ন দ্রব্য রূপান্তরিত হলো পণ্যে" (পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি)।

সমাজের উৎপাদন যখন ছিল মূলতঃ সমষ্টিগত, তখন ভোগ দখলও হতো ছোট বড় গোষ্ঠীর মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষভাবে বন্টন করে। এ কথা ঠিক যে, এই সমষ্টিগত উৎপাদন অত্যন্ত সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে চলতো। উৎপাদকেরা তখন নিজেদের মধ্যে নিজেদের উৎপাদনের কাজকর্মের আদান-প্রদান করতো, কিন্তু তখনো উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় দেখা দেয়নি। যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকাশ

লাভ করলো তখন সম্পত্তির মালিক দেখলো যে, যে-সব উৎপন্ন দ্রব্য সে আত্মসাৎ করেছে তার সবটাই তার নিজের জন্য প্রয়োজন নয়, তখন সে সেগুলি অন্য উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বিনিময় করতে আরম্ভ করলো।

এর পরিণাম হলো সুদূর-প্রসারী। এঙ্গেলসের কথায়ঃ "উৎপাদকেরা যেই নিজেদের উৎপন্ন জিনিস আর প্রত্যক্ষভাবে ভোগ না করে বিনিময়ের মধ্যে একে হাতছাড়া করলো, অমনি তারা এর উপর দখল হারালো। সে উৎপন্ন দ্রব্যের কি গতি হবে সেটা তারা আর জানতে পারতো না এবং এমন একটি সম্ভাবনা দেখা দিল যাতে একদিন উৎপাদকের বিরুদ্ধেই উৎপন্ন দ্রব্যকে প্রয়োগ করা হবে, তাদের শোষণ ও পীড়নের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হবে।" (পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি)।

এঙ্গেলস ঐ গ্রন্থে আরও বলেছেনঃ "পণ্য উৎপাদনের সঙ্গেই এলো নিজ নিজ কারবার হিসাবে ব্যক্তিগত কৃষকদের জমিচাষ, অল্প পরেই আসে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা। তারপর এলো মুদ্রা; এই সর্বজনীন পণ্য যার বিনিময়ে সব পণ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু মুদ্রা আবিষ্কার করার সময় মানুষ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে, তারা এমন একটি নতুন সামাজিক শক্তি সৃষ্টি করছে, এমন একটা সর্বজনীন শক্তি সৃষ্টি করছে, যার কাজে সমগ্র সমাজ মাথা নোয়াতে বাধ্য।"

পণ্য বিনিময় এবং মুদ্রার প্রচলনের ফলে সম্পত্তির মালিকানা এসে কেন্দ্রীভূত হলো অল্প কয়েকজনের হাতে, আর অন্য সবাই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলো। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সমাজে দেখা দিল বিত্তবান আর বিত্তহীনের দল।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমবিভাগের আর একটা দিক আছে। শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমবিভাগ যুক্ত। আগে একটা সমগ্র উপজাতির উৎপাদন ক্ষমতা সমস্ত উৎপাদকের ন্যূনতম প্রয়োজনও মিটাতে পারতো না, কিন্তু সমাজের বিকাশের একটা স্তরে উৎপাদিকা শক্তির উন্নয়নের ফলে শ্রম উদ্বৃত্ত জিনিসও উৎপন্ন করতে আরম্ভ করলো—যারা কাজ করতো তারা তাদের প্রয়োজন মেটাবার জিনিস তো তৈরী করতোই এমন কি তারও বেশি জিনিস উৎপন্ন করতো। তাই তখন এই সম্ভাবনাই দেখা দিল যে, যাদের হাতে রয়েছে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা তারা শ্রম না করেই অন্যের শ্রমের উদ্বৃত্তটুকু আত্মসাৎ করতে পারবে এবং এই সম্ভাবনা যখন বাস্তব হয়ে উঠলো তখন তারাই এর সুযোগ গ্রহণ করলো। এরই ফল হিসাবে সমাজে প্রথম দেখা দিল দাস ব্যবস্থা। দাস ব্যবস্থাই হচ্ছে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের প্রথম রূপ।

দাস ব্যবস্থায় দাস-মালিকরাই উৎপাদনের উপায়ের মালিক। তারাই দাসদের

দিয়ে উৎপাদনের কাজ করিয়ে নেয়। তারাই দাসদের শোষণ করে, তারাই দাসদের মালিক। শোষণের এটাই হচ্ছে প্রথম রূপ। এরপর এলো মধ্যযুগে অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ভূমি-দাসত্ব, আর আধুনিক যুগে অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজে মজুরি শ্রম। ভূমি-দাসত্বের যুগে জমি অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়ের মালিক ছিল জমিদারেরা, তারা ভূমিদাসদের (সার্ফদের) মালিক ছিল না সত্য কিন্তু জমির মালিকানার দৌলতে তারা ভূমিদাসদের শ্রমের ফলের বিরাট অংশ আত্মসাৎ করতো। মজুরি-শ্রমের ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা মজুরদের শ্রমের ফলের বিরাট অংশই আত্মসাৎ করে। এখানে মনে হবে যে শ্রমিকেরা স্বাধীন, তারা দাসদের মতন মালিকের সম্পত্তি নয়, আবার ভূমিদাসদের মতন জমির সংগে বাঁধাও নয়। কিন্তু এখানে উৎপাদনের উপায়সমূহ পুঁজিপতিদের অধিকারে এবং শ্রমিকরা উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থেকে বঞ্চিত। পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রম বিক্রি করেই তাদের জীবনধারণ করতে হয় এবং উৎপাদনের উপায়ের মালিক হিসাবে পুঁজিপতিরা শ্রমিকের ফলের বিরাট অংশ আত্মসাৎ করে।

এই হচ্ছে শোষণের বিভিন্ন রূপ। কিন্তু শোষণের রূপ যতই বিভিন্ন হোক না কেন, তার মূল কথা হলো ঃ যারা উৎপাদক তারা তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও বেশি দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন করে এবং যারা উৎপাদক নয় তারা উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার দৌলতে প্রকৃত উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য আত্মসাৎ করে।

৪

বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণীসমূহ

শোষণ-ভিত্তিক সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীগুলি আবার দুটো ভাগে বিভক্ত—একটা ভাগে রয়েছে সমাজের প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলি বা মূল শ্রেণীগুলি, আর একটা ভাগে রয়েছে যে শ্রেণীগুলি প্রধান বা মূল শ্রেণী নয়। আমরা সেই শ্রেণীগুলিকেই প্রধান বা মূল শ্রেণী বলে থাকি যাদের ছাড়া সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি টিকে থাকতে পারে না। আবার সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ীই ঐ সব মূল শ্রেণীর আবির্ভাব। দাস-সমাজে দাস-মালিক আর দাসেরাই ছিল দুটি মূল শ্রেণী; সামন্ততান্ত্রিক সমাজে মূল শ্রেণী দুটি ছিল সামন্ত প্রভুরা আর ভূমিদাসেরা; বুর্জোয়া সমাজে এ দুটি হলো পুঁজিপতিরা আর শ্রমিকেরা। এদের মধ্যে একটা শ্রেণী হচ্ছে শোষক শ্রেণী, তারাই উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক, তাদের হাতেই সমাজের রাষ্ট্রক্ষমতা, তারা সমাজের কর্তৃত্ব করে, আর একটা শ্রেণী হচ্ছে শোষিত শ্রেণী। এই দুটো শ্রেণীর সম্পর্ক হচ্ছে পরস্পর-বিরোধী সম্পর্ক। যেমন পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফার পাহাড় বানাবার জন্য শ্রমিকদের দিয়ে বেশি বেশি উৎপাদন করায় এবং তাদের যতদূর সম্ভব কম মজুরি

দেবার চেষ্টা করে। শ্রমিকেরা নিজেদের বাঁচার মতো মজুরির জন্য লড়াই করে। এই দুই শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী এবং এর ফলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে চলে সংগ্রাম। দাস-সমাজে দাস-মালিক আর দাসদের মধ্যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্ত প্রভু আর ভূমি-দাসদের মধ্যে এই সংগ্রাম চলেছিল। বুর্জোয়া সমাজে এই সংগ্রাম চলছে বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে।

কিন্তু শোষণ-ভিত্তিক সমাজে এই মূল শ্রেণীগুলি, এই পরস্পর-বিরোধী সম্পর্কের শ্রেণীগুলি ছাড়াও এদের পাশে অন্যান্য শ্রেণীও থাকে। যেমন দাস-সমাজে ছিল মুক্ত কৃষক ও কারিগর, পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত ছাড়াও রয়েছে মধ্যবিত্তরা, কৃষকেরা, এবং বহু দেশে জমিদারেরা।

বুর্জোয়া সমাজে মূল শ্রেণী দুটো হলো পুঁজিপতিরা (বুর্জোয়া) আর শ্রমিকেরা (প্রলেতারিয়েত)। মূল উৎপাদনসমূহের মালিক হচ্ছে বুর্জোয়ারা। তারা শ্রমিকদের শোষণ করে জীবনধারণ করে। পুঁজিবাদী সমাজে তারাই হচ্ছে শাসক শ্রেণী। তারা যে বিরাট ধন সম্পদ আত্মসাৎ করে তার স্রষ্টা হচ্ছে শ্রমিকেরা—এই শ্রমিকেরাই হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজে প্রধান উৎপাদিকা-শক্তি। এই শ্রমিকেরা হচ্ছে সেই শ্রেণী যারা উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা থেকে বঞ্চিত—জীবনধারণের জন্য এরা নিজেদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। মনে রাখা দরকার যে, ধনতান্ত্রিক বিকাশের সাধারণ নিয়ম হিসাবেই এদের, এই আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, ধনিক বা শ্রমিকের ইচ্ছার উপর এদের আবির্ভাব নির্ভর করে না। এই শ্রমিক শ্রেণীর সংগে চলে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগ্রাম ; মার্কস-এংগেলস রচিত "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"র ভাষায় : "বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের মূল শর্ত হল পুঁজির সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ; পুঁজির সৃষ্টি আবার নির্ভর করে মজুরি শ্রমের উপর। মজুরি শ্রম সম্পূর্ণভাবে মজুরদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যন্ত্রশিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিদের প্রতিযোগিতা হেতু (বা প্রতিযোগিতার দরুন উদ্ভূত) বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন হেতু (বা সমাবেশের দরুন উদ্ভূত) বিপ্লবী ঐক্য। সুতরাং সে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী উৎপাদন করে ও উৎপন্ন সামগ্রী দখল করে, আধুনিক শিল্পে বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্জোয়া সৃষ্টি করছে সর্বোপরি তারই সমাধি-খনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুই সমান অনিবার্য।

কিন্তু এমন কোনো পুঁজিবাদী দেশ নেই যেখানে সমাজ শুধু এই দুটি শ্রেণী নিয়েই—বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত নিয়েই গঠিত। এ রকম "বিশুদ্ধ রূপে" পুঁজিবাদের অস্তিত্ব কোথাও কখনো ছিল না এবং এখনো নেই। একথা

ঠিক যে ধনতন্ত্রের বিকাশধারায় জাতীয় অর্থনীতির সকল শাখায় পুঁজি অনু-প্রবেশ করে এবং সে-সব শাখায় রূপান্তরও ঘটায়, কিন্তু পুঁজি কোথাও পুরনো অর্থনৈতিক রূপগুলিকে এক আঘাতে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয় না। "বিশুদ্ধ" পুঁজিবাদী সমাজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া পুঁজি-বাদী সমাজে দীর্ঘকাল ধরেই সামন্ত সমাজের অবশেষ বিরাজ করতে থাকে।

সেজন্যই আমরা দেখতে পাই যে বহু বুর্জোয়া দেশে জমিদারেরা বিশাল বিশাল জমি দখল করে রয়েছে। এই সব জমিদার পুঁজিবাদী পন্থায় তাদের জমিদারিব অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করে, কৃষিকার্যে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করে এবং নিজেরা পুঁজিবাদী-জমিদার হয়ে ওঠে। এই সব জমিদারের পাশেই রয়েছে জোতদারেরা আর কৃষকেরা। কৃষকদের মধ্যে আবার স্তর ভেদ আছে। কৃষকদের মধ্যে রয়েছে ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক, গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুর বা কৃষিমজুর। শ্রেণী হিসাবে কৃষক হচ্ছে শোষিত শ্রেণী, অবশ্য কৃষকের বিভিন্ন স্তরের ক্ষেত্রে শোষণের মাত্রাও বিভিন্ন। কৃষকদের এই স্তর ভেদ সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কর্মসূচীতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তার উল্লেখ করলে এই বিষয়টা সহজে বুঝা যাবে।

ঐ কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ঃ

"...আমাদের কৃষক সমাজ এই ধরনের একটি জনসমষ্টি নয়; এটাও সুবিদিত যে, ধনতন্ত্র কৃষক সমাজের মধ্যে চূড়ান্ত ভাবেই অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদেব মধ্যে নির্দিষ্ট স্তর ভেদ নিয়ে এসেছে। তাদের বিভিন্ন অংশ বিপ্লবে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কৃষিমজুর ও গরিব কৃষক হচ্ছে গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৭০ ভাগ এবং তারা জমিদারদের দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত; বর্তমান সমাজে তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যেই তারা হবে শ্রমিক শ্রেণীর মূলে মিত্র।

মাঝারি কৃষকও গ্রামাঞ্চলের তেজারতী মূলধনের, সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক জমিদারদের এবং ধনতান্ত্রিক বাজারের লুঠের শিকার হয়; গ্রামীণ জীবনে জমিদারদের আধিপত্য মাঝারি কৃষকদের সামাজিক মর্যাদার উপর এমন অসংখ্য-ভাবে আঘাত করে যে তারা গণতান্ত্রিক মোর্চার আস্থাভাজন মিত্রে পরিণত হয়।" (১০২ নং ধারা)

"ধনী কৃষক হচ্ছে কৃষক সমাজের মধ্যে আর একটি প্রভাবশালী অংশ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে. কংগ্রেসী কৃষি সংস্কারে তাদের কোন কোন অংশ উপকৃত হয়েছে এবং স্বাধীনতা-উত্তর নতুন রাজত্বে তারা কিছুটা লাভবানও হয়েছে। তারা ধনতান্ত্রিক জমিদারে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং তাদের ক্ষেতের কাজের জন্য ভাড়ায় কৃষিমজুর নিয়োগ করার দরুন কৃষিমজুরের প্রতি

বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে। এ সব সত্ত্বেও গুরুতর করের বোঝা, শিল্প-জাত পণ্যাদির চড়া দাম ও মুদ্রাস্ফীতি তাদের অনবরত বিব্রত করে, তাদের ভবিষ্যতকে করে অনিশ্চিত। বিদেশী ও ভারতীয় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের দ্বারা কবলিত বাজারের লুটের শিকার হবার কারণে ধনী কৃষক প্রায়ই বুর্জোয়া জমিদার সরকারের অনুসৃত পীড়নমূলক নীতিসমূহের বিরুদ্ধে চলে আসে। সেজন্য মোটামুটিভাবে তাদেরও গণতান্ত্রিক মোর্চায় নিয়ে আসা যেতে পারে এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্র হিসাবে রাখা যেতে পারে"। (১০৩ নং ধারা)

কৃষক ছাড়াও তাদেরই পাশাপাশি রয়েছে মধ্যবর্তী শ্রেণী যাদের বলা হয়ে থাকে পেটি বুর্জোয়া। পরিশ্রম করে এদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়—এরা কাজ করে ছোট ছোট দোকানদার, ছোট ছোট ব্যবসায়ী হিসাবে, অফিসে, আদালতে, সরকারী দফতরে এরা সাধারণত কাজ করে কর্মচারী হিসাবে, বিদ্যায়তনে কাজ করে অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষক, শিক্ষিকা হিসাবে। পুঁজি-বাদী সমাজে এরাও শোষণ যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কর্মসূচীতে এদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

"শহরের মধ্যবর্তী শ্রেণী এবং অন্যান্য মধ্যবর্তী শ্রেণীও—যাদের বেতন পর্যাপ্ত নয়, অন্যান্য সূত্রে উপার্জনও খুব সামান্য—তারাও বিদেশী একচেটিয়া মূলধনের সঙ্গে আপস ও জমিদারদের সঙ্গে মিত্রতার পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ অনুসরণকারী বুর্জোয়া জমিদার শাসনের অধীনে দারুণ দুর্ভোগ ও দুর্দশা ভোগ করে। খাদ্য, বস্ত্র ও জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসের নিত্য ঊর্ধ্ব-মুখী দাম—উচ্চ বাড়ি ভাড়া, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্রমবর্ধমান চাপ—এ সব কিছুই তাদের কঠোরভাবে আঘাত করছে। বেকারী হচ্ছে আর একটি অভিশাপ যা নিরন্তর তাদের ব্যতিব্যস্ত করছে। এই শ্রেণী গণতান্ত্রিক মোর্চার মিত্র হতে পারে এবং হবে ; বিপ্লবের সপক্ষে তাদের নিয়ে আসার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা দরকার।" (১০৪ নং ধারা)

এ ছাড়া বুর্জোয়া সমাজে আর একটা স্তরও আমরা দেখতে পাই যাদের বলা হয়ে থাকে লুম্পেন প্রলেতারিয়েত।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস এই লুম্পেন প্রলেতারিয়েত সম্বন্ধে লিখেছিলেন ঃ

"পুরানো সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে ছিটকে পড়া যে সব লোক নিষ্ক্রিয়-ভাবে পচছে সেই সামাজিক আবর্জনাটিকে, সেই 'বিপজ্জনক শ্রেণীকে' শ্রমিক বিপ্লব এখানে ওখানে আন্দোলনের মধ্যে ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসতে পারে ; কিন্তু

এদের জীবনযাত্রার ধরনটা এমনই যে তা প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের ভাড়াটে হাতিয়ারের ভূমিকার জন্যই তাদের অনেক বেশি তৈরি করে তোলে।"

এই "সামাজিক আবর্জনা" সম্বন্ধে মার্কস তাঁর "ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০" গ্রন্থে তৎকালীন ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকারের সচল রক্ষিবাহিনীর (Mobile guards) স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ—

'এদের অধিকাংশই ছিল লুম্পেন প্রলেতারিয়েত, সব বড় শহরেই যারা শিল্পে-রত প্রলেতারিয়েত থেকে সুস্পষ্টভাবেই স্বতন্ত্র এক জনতা, চোর ও সব রকমের অপরাধীদের যোগান আসে যাদের মধ্য থেকে ; সমাজের উচ্ছিষ্টজীবী এমন সব লোক—যাদের নির্দিষ্ট কোনো বৃত্তি নেই ; যারা ভবঘুরে, যাদের চাল নেই চুলোও নেই ; যে জাতির তারা অন্তর্ভুক্ত তার সভ্যতার মাত্রা অনুযায়ী তাদের ভিতর ইতরবিশেষ থাকলেও তারা কিছুতেই নিজেদের লাজারোনি চরিত্র হারায় না (Lazzaroni—ইতালিতে জনসংখ্যার ভিতরে শ্রেণীচ্যুত লুম্পেন প্রলেতারীয় লোক। স্বেচ্ছাচারী সরকারেরা প্রতি বিপ্লবী উদ্দেশ্যে তাদের বারবার ব্যবহার করেছে—লেখক)। একেবারে নমনীয়, এমন কাঁচা বয়সে অস্থায়ী সরকার এদের বাহিনীভুক্ত করেছিল এই জন্য যে নিভীকতম কার্যকলাপ ও চরমতম আত্মত্যাগও যেমন, তেমনি আবার জঘন্যতম গুণ্ডামি ও নিকৃষ্টতম দুর্নীতি—সবই এদের পক্ষে সম্ভব ছিল।"

আমাদের দেশের নকশালপন্থীরা সত্তর দশকে বলতো যে, লুম্পেন হলেও এরা তো প্রলেতারিয়েতের মধ্য থেকে এসেছে এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে এরা হচ্ছে প্রলেতারিয়েতের মিত্র।

কিন্তু কি ধরনের মিত্র এরা?

এঙ্গেলস তাঁর "জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ" গ্রন্থের মুখবন্ধে এই মিত্রের প্রশ্ন সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ

"সম্ভাব্য সমর্থকদের মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট হল সমাজের সমস্ত শ্রেণীর লোচ্চা লুম্পেন হাঘরের দল যারা হল সমাজের নর্দমার গাদ। এদের মূল ঘাঁটি হল শহরে শহরে। এই উচ্ছৃংখল জীবগুলোকে অতি সহজে কেনা যায়, এবং এরা একেবারে নির্লজ্জ। ফরাসী শ্রমিকেরা যে দেয়ালে দেয়ালে লিখেছিল 'লুট-বাজদের খতম করো' (১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের সময় শ্রমিক বিক্ষোভ ও আন্দোলনের সুযোগে শহরের লুম্পেন হাঘরেরা ব্যাপকভাবে লুটতরাজ শুরু করেছিল। তাদের উচ্ছৃংখলতায় অতিষ্ঠ হয়ে শ্রমিকেরা আওয়াজ তুলেছিল 'লুট-বাজদের খতম করো'—লেখক) তার কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি শ্রমিকদের ভক্তি শ্রদ্ধা নয়, তারা সঠিকভাবে বুঝেছিল যে এই গুণ্ডার দলকে তাদের মধ্য থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেওয়া আবশ্যক। যে নেতা এই সমস্ত মস্তানদের

রক্ষী হিসাবে ব্যবহার করে অথবা এদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে, তারা শুধু এই কাজটিরই দ্বারা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে দায়ী হয়।"

এঙ্গেলসের এই বক্তব্য থেকে এটা ভালো-ভাবেই পরিষ্কার হচ্ছে যে, লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের সংগ্রামের বাহিনী হিসাবে কাজে লাগানো এবং এই সামাজিক আবর্জনার সমর্থনের উপর নির্ভর করার অর্থ হলো শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। লুম্পেন প্রলেতারিয়েত কি রকম "বিপজ্জনক শ্রেণী" এবং কাদের স্বার্থে ভাড়াটে বাহিনী হিসাবে কাজ করে, তার বিশদ বিবরণ মার্কস দিয়েছেন তাঁর "লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার" গ্রন্থে। এই গ্রন্থে মার্কস ফ্রান্সে লুই বোনাপার্টের ক্ষমতা দখলের কাহিনী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন যে, লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের অভিযানে প্যারিসের লুম্পেন প্রলেতারিয়েতরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এদের নিয়েই লুই বোনাপার্ট তার "দশই ডিসেম্বরের সমিতি" গঠন করেছিল। এ তো গেল উনবিংশ শতকের কথা। আমাদের এই বিংশ শতকেই জার্মানিতে নাৎসী নায়ক হিটলার জার্মানির লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের নিয়ে গঠন করেছিল তার ঝটিকা বাহিনী ব্রাউন শার্ট। ইতালীতে এদের নিয়েই ফ্যাসিস্ট নায়ক মুসোলিনী গড়ে তুলেছিল তার ব্ল্যাক শার্ট বাহিনী। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের দিনগুলিতে এই লুম্পেনদের নিয়ে কংগ্রেসী শাসকেরা গড়ে তুলেছিল তাদের মস্তান বাহিনী।

বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণী পার্থক্যের এই হচ্ছে চিত্র। এ চিত্র খুব জটিল। এ কথাটা শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিকে মনে রাখা দরকার তার সঠিক কর্মনীতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণের সময়।

৫

রাষ্ট্রের আবির্ভাব

মানব সমাজের বিকাশের মধ্যেই রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটেছে। সমস্ত রাজনীতির গোড়ার প্রশ্ন, মূল প্রশ্ন হলো রাষ্ট্র। এটি হলো মানব সমাজের জীবনে সর্বাধিক জটিল প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি ভালোভাবে বুঝবার, এর মর্মবস্তু, এর তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করবার চাবিকাঠি আমরা পাই শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণীসংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্যে।

মানব সমাজের বিকাশের ধারার মধ্যে রাষ্ট্রের বিকাশ সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেন : "বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী শেষ বিচারে ইতিহাসে নির্ধারক উপাদান হচ্ছে প্রত্যক্ষ জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন। কিন্তু এ ব্যাপারটির প্রকৃতি হচ্ছে দ্বিবিধ। একদিকে জীবনযাত্রার উপকরণ—খাদ্য, পরিধেয় ও আশ্রয় এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদন ; অপর দিকে মানব জাতির জৈবিক উৎপাদন, বংশ বৃদ্ধি। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে একটি বিশেষ দেশে মানুষ যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাস করে, সেগুলি এই দ্বিবিধ উৎপাদনের দ্বারা নির্ধারিত হয় : একদিকে শ্রমের বিকাশের অপরদিকে পরিবারের বিকাশের স্তর দিয়ে। শ্রমের বিকাশ যত কম হয় এবং উৎপন্নের পরিমাণ ও সেইহেতু সমাজের সম্পদ যত সীমাবদ্ধ হয়, তত বেশি সমাজব্যবস্থা কৌলিক সম্পর্ক দিয়ে পরিচালিত মনে হয়। কিন্তু কৌলিক বন্ধনের ভিত্তিতে গঠিত এই সমাজ কাঠামোর মধ্যে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ পায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিনিময়, ধনের অসাম্য, অপরের শ্রমশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং তার ফলে শ্রেণীবিরোধের ভিত্তি : নবজাত সামাজিক উৎপাদনগুলি কয়েক পুরুষ ধরে পুরাতন সামাজিক সংগঠনকে নতুন অবস্থানগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে, অবশেষে উভয়ের এই গরমিল থেকে আসে পরিপূর্ণ বিপ্লব। কৌলিক বন্ধনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পুরাতন সমাজ নবজাত সামাজিক শ্রেণীগুলির সংঘাতে চুরমার হয়ে যায় ; তার জায়গায় দেখা দেয় রাষ্ট্র হিসাবে সংগঠিত একটি নতুন সমাজ—এখন নিম্নতম ইউনিটগুলি আর কৌলিক গোষ্ঠী নয়—আঞ্চলিক গোষ্ঠী। এরূপ সমাজে পারিবারিক প্রথা পুরোপুরি মালিকানা প্রথার অধীন এবং যে শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রাম এ যাবৎকাল সমগ্র লিখিত ইতিহাসের মর্মবস্তু, সেটা তার মধ্যে অবাধে বিকাশ পেতে থাকে।" ("পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" গ্রন্থের ১৮৮৪ সালের ভূমিকা)।

এঙ্গেলসের এই বক্তব্য থেকে এই ধারণাই সুস্পষ্ট হয় যে, সমাজ বিকাশের বিশেষ একটা স্তরেই রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব এবং মানব সমাজের ইতিহাসে এমন একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না। যখনই সমাজ শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত হলো, দেখা দিল শোষক ও শোষিত শ্রেণী এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রাম, তখনই দেখা দিল রাষ্ট্র নামক সংস্থা। রাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব।

সমাজ বিকাশের ধারায়ই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরন দেখা দিয়েছে। সমাজে যখন কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না, তখন রাষ্ট্র বলেও কিছু ছিল না। সমাজ যখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রূপান্তরিত হলো তখনই দেখা দিল

রাষ্ট্র। প্রাচীনকালে অর্থাৎ দাস সমাজব্যবস্থায় এই রাষ্ট্র ছিল দাস-মালিক নাগরিকদের রাষ্ট্র ; মধ্যযুগে এই রাষ্ট্র ছিল সামন্ত অভিজাতবর্গের রাষ্ট্র, আর আমাদের যুগে অর্থাৎ ধনতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্র হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্র। সমাজ ব্যবস্থায় যারা যখন মূল শোষকশ্রেণী, তখন সেই সমাজের রাষ্ট্র হচ্ছে সেই শ্রেণীর হাতে অন্য শ্রেণীদের উৎপীড়ন করার যন্ত্র বিশেষ।

মার্কসের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্রবিশেষ। এক শ্রেণীর দ্বারা আর এক শ্রেণীর উপর নির্যাতন চালাবার, উৎপীড়ন চালাবার যন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র। এক শ্রেণীর উপর আর এক শ্রেণীর আধিপত্য অটুট রাখার যন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র। শ্রেণীগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার, সেই আধিপত্য কায়েম রাখার, অন্য পদানত শ্রেণী-গুলিকে একটি শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীনে রাখার যন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র।

সাধারণতঃ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রকে দেখানো হয়ে থাকে ন্যায় ধর্মের প্রতীক হিসাবে, "নৈতিকবোধের বাস্তব রূপ হিসাবে, প্রজ্ঞার প্রতিচিত্র ও বাস্তব রূপ" হিসাবে, আবার কোথাও ঐশ্বরিক শক্তির আধার হিসাবে। কিন্তু রাষ্ট্রের আসল রূপ তা নয়। রাষ্ট্রের উদ্ভবের মধ্যেই রাষ্ট্রের আসল চেহারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যখন ও যেখানেই সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে শোষক ও শোষিত শ্রেণী, তখনই সেখানে দেখা দিয়েছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব, শোষক ও শোষিতের অস্তিত্ব।

এঙ্গেলসের কথায়ঃ "রাষ্ট্র মোটেই বাইরে থেকে সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি শক্তি নয়, সেই সঙ্গে হেগেল যা বলতেন, সেইভাবে "নৈতিক ভাবের বাস্তবতা" 'প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি' ও বাস্তবতাও একে বলা যায় না। পরন্তু এটা বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে সমাজ থেকেই উদ্ভূত ; সমাজ নিজের ভিতরকার সমাধানহীন বিরোধগুলির মধ্যে একেবারে জড়িয়ে পড়েছে, এমন অনপনেয় দ্বন্দ্বে সে বিভক্ত যার নিরাকরণ করতে সে অক্ষম—এই অবস্থার স্বীকৃতি হলো রাষ্ট্র। কিন্তু যাতে এইসব বিরোধ, বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্বলিত শ্রেণীগুলি নিজেদের এবং সমাজকেও নিষ্ফল সংগ্রামের মধ্যে ধ্বংস করে না ফেলে তার জন্য দরকার হলো এমন একটা শক্তি—যা আপাতদৃষ্টিতে সমাজের উর্ধ্বে থেকে এই সংগ্রামকে সংযত করবে, একে 'শৃঙ্খলার' চৌহদ্দির মধ্যে রাখবে। এবং এই যে শক্তি সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়ে তার উর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ক্রমাগত সমাজ থেকে পৃথক হতে থাকে, সেই শক্তিই হলো রাষ্ট্র।" (পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি)

ঐ গ্রন্থে এঙ্গেলস আরও বললেনঃ "যেহেতু রাষ্ট্রের আবির্ভাব শ্রেণী বিরোধকে সংযত করবার প্রয়োজন থেকে, সেই সঙ্গে তার উদ্ভব হয় শ্রেণী

বিরোধের মধ্যেই, সেজন্য রাষ্ট্র হলো সাধারণত সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র ; এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর দমন ও তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে।"

এংগেলসের এই মন্তব্য সম্পর্কে লেনিন তাঁর "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থে লিখেছিলেন ঃ "এখানে রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তার তাৎপর্যের প্রশ্নে মার্কসবাদের মূল চিন্তাধারা অভিব্যক্ত হয়েছে পরিপূর্ণ স্পষ্টতায়। রাষ্ট্র হলো শ্রেণীবিরোধের—অমীমাংসেয়তার ফল ও অভিব্যক্তি। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সেই-খানে, সেই সময় এবং সেই পরিমাণে—যেখানে, যে সময় এবং যে পরিমাণে বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রেণী বিরোধের সমাধান হতে পারছে না। এবং বিপরীতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, শ্রেণীবিরোধ অমীমাংসেয়।"

রাষ্ট্র হলো সাধারণত সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র—এংগেলসের এই বক্তব্যের সারবত্তা ধনতন্ত্রী সমাজেই অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। ধনতন্ত্রী সমাজে সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণী হলো ধনিকশ্রেণী বা বুর্জোয়াশ্রেণী। তাই ধনতন্ত্রী সমাজে যে রাষ্ট্র আমরা দেখছি, সে রাষ্ট্র হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্র—বুর্জোয়া রাষ্ট্র। বুর্জোয়া শাসকের এই রাষ্ট্রকেই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠরূপ বলে প্রচার করে থাকে। এই রাষ্ট্রেই নাকি গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে। আমাদের ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারেরাও এই কথা বলে থাকেন। আসলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গণ-তন্ত্র হলো ধনতন্ত্রী সমাজে শাসকশ্রেণীর গণতন্ত্র যাকে সাধারণ কথায় বলা হয়ে থাকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র। এ কথা ঠিক যে, "সামন্ততন্ত্রের তুলনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র হচ্ছে এক বিরাট ঐতিহাসিক অগ্রগতি, তা সত্ত্বেও বুর্জোয়া গণতন্ত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সংস্থা বিশেষ—এ গণতন্ত্র চরম ভণ্ডামিতে ভরপুর এবং ধনিকদের জন্য এটা একটা স্বর্গ, কিন্তু শোষিতের জন্য, গরিবদের জন্য এটা হচ্ছে একটা ফাঁদ ; এটা হচ্ছে শোষিতদের, গরিবদের প্রবঞ্চনা করারই সংস্থা বিশেষ। ধনতন্ত্রের যুগে এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।" (লেনিন ঃ প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউতস্কি)।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস ও এংগেলসের তত্ত্বকথা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রিপাবলিকও বুর্জোয়াদের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর নিষ্পেষণের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রের ক্ষমতার আধার হচ্ছে পুলিস, সশস্ত্র বাহিনী, আর আমলাতন্ত্র ; এরা জনগণ থেকে পৃথক, এরা জন-গণের বিরুদ্ধে।

এংগেলস রাষ্ট্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁর "পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এংগেলসের কথায়ঃ "পুরাতন গোত্র-সংগঠনের বিপরীতে, রাষ্ট্র প্রথমতঃ প্রজাদের আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করে।...আঞ্চলিক ভিত্তিতে নাগরিকদের সংগঠনই সমস্ত রাষ্ট্রের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ একটি পাবলিক ক্ষমতার (যা সামাজিক শক্তির) প্রতিষ্ঠা যা সশস্ত্র বাহিনীরূপে সংগঠিত জাতির সংগে প্রত্যক্ষভাবে মিলছে না। এই বিশেষ পাবলিক ক্ষমতা প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ সমগ্র জনসংখ্যাকে নিয়ে একটি স্বয়ংচালিত অস্ত্রসজ্জিত সংগঠন শ্রেণী-বিভাগের সময় থেকে আর সম্ভব ছিল না। জনসংখ্যার মধ্যে ক্রীতদাসরাও ছিলঃ এথেন্সের ৯০,০০০ নাগরিক ৩,৬৫,০০০ ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে ছিল একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী। এথেনীয় গণতন্ত্রের গণফৌজ ছিল ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে অভিজাতদের এক পাবলিক ক্ষমতা—যা দাসদের সংযত রাখত; কিন্তু নাগরিকদের সংযত রাখার জন্য একটি পুলিসবাহিনীও প্রয়োজন ছিল......। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই থাকে এই পাবলিক ক্ষমতা; এতে শুধুমাত্র অস্ত্রধারী লোক থাকে না, আরও থাকে নানা বৈষয়িক লেজুড়—জেলখানা ও বিভিন্ন রকমের বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ—এ সবের কিছুই গোত্র-ভিত্তিক সমাজে ছিল না।..."

"এই পাবলিক ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকার নাগরিকদের কাছ থেকে চাঁদা—ট্যাক্স। গোত্র সমাজে এইসব ব্যাপার একেবারে অজানা, কিন্তু আজকের দিনে আমরা এর অস্তিত্ব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে শুধু ট্যাক্সে আর কুলায় না; রাষ্ট্র তখন ভবিষ্যৎ হুণ্ডি দেয়, ঋণ করে—রাষ্ট্রীয় ঋণ।..."

"পাবলিক ক্ষমতা ও ট্যাক্স ধার্য করার অধিকারের বলে এখন রাজপুরুষেরা সমাজের সংস্থা হিসাবে সমাজের ঊর্ধ্বে ওঠে। গোত্র প্রথার বিভিন্ন সংস্থা যে স্বাধীন ও স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রদ্ধা পেত, এরা তা যদিও বা পেত তবুও তাতে আর সন্তুষ্ট থাকতো না; তারা এমন একটা ক্ষমতার বাহন যা ক্রমেই সমাজের কাছে বিজাতীয় হতে থাকে এবং তাই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য বিশেষ বিশেষ আইনের সাহায্য নিতে হয়, যেগুলির জোরে তারা বিশেষ বিশেষ পবিত্রতা ও অলংঘনীয়তা ভোগ করে। সভ্য রাষ্ট্রের সবচেয়ে আনাড়ী পুলিস কর্মচারীরও কর্তৃত্ব হচ্ছে গোত্র সংগঠনের সমস্ত সংস্থার চেয়ে বেশি; কিন্তু সভ্যতার যুগে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা ও শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক অথবা সেনাপতিও বেশ ঈর্ষা করবেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক গোত্র-প্রধানকে যিনি কোন পীড়ন না করে অবিসংবাদিত শ্রদ্ধা পেতেন। শেষের জন সমাজের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত অথচ অন্য জন সমাজের বাইরে ও তার ঊর্ধ্বে কিছু একটার প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করতে বাধ্য।"

এঙ্গেলসের এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হলো ঃ

(১) জনপদের ভিত্তিতে বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে নাগরিকদের বা জনসংখ্যার সংগঠন ;

(২) নিপীড়ন চালাবার পাবলিক ক্ষমতা বা সামাজিক শক্তির অস্তিত্ব ;

(৩) এই পাবলিক ক্ষমতাকে বা সামাজিক শক্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কর ধার্যের ও আদায়ের বিশেষ ক্ষমতা।

রাষ্ট্রের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলে রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ বুঝা সহজ হয়। তা হলে রাষ্ট্রের মূল কথা হলো শ্রেণী-শাসন। "ইতিহাসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে, নাগরিকদের অধিকার স্থির হয় ধন সম্পত্তি অনুপাতে এবং এইভাবে প্রত্যক্ষভাবে এই তথ্য প্রকাশ পায় যে, রাষ্ট্র হচ্ছে বিত্তহীন শ্রেণীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিত্তবান শ্রেণীর একটি সংগঠন।" (এঙ্গেলস)

এই সংগঠনকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে বিত্তবান শ্রেণী সমাজে নিজের শাসন ও শোষণ বজায় রাখে। তাই রাষ্ট্র হচ্ছে ঃ

—অন্য শ্রেণীদের উপর একটি শ্রেণীর শাসন বজায় রাখার যন্ত্র ;—একটি শ্রেণীদ্বারা অপর শ্রেণীগুলির উপর নিপীড়ন চালাবার যন্ত্র ; অন্যান্য পদানত শ্রেণীকে একটি শ্রেণীর প্রভুত্বাধীনে দাবিয়ে রাখার যন্ত্র।

৬

রাষ্ট্রের সারবস্তু কি ?

সমাজ বিকাশের ধারার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সারবস্তুটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে শ্রেণীর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব বিরাজ করে সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতাই হলো বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল কথা এবং এই রাজনৈতিক ক্ষমতাই প্রভুত্বকারী শ্রেণী নিজের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করে। সেইজন্যই মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে বারবার এই কথাই বলেছেন যে, রাষ্ট্র এক শ্রেণীর হাতে অপর শ্রেণীর নিপীড়নের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। রাষ্ট্র হলো শোষকশ্রেণীর হাতে উৎপীড়নের যন্ত্র, নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব বজায় রাখার যন্ত্র, অন্য পদানত শ্রেণী-

গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে রাখার যন্ত্র। এই যন্ত্রের নানান ধরন দেখা যায় রাষ্ট্রের আবির্ভাব ও বিকাশের মধ্যে। শোষণের রূপ পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের রূপও পালটিয়েছে ; শাসনের এই নানান ধরনের অনেক পার্থক্য দেখা গেছে, কিন্তু তার সারবস্তু একই রয়ে গিয়েছে। যেমন, প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি দাসদের দমনের জন্য দাস-মালিকদের রাষ্ট্র ; মধ্যযুগে, অর্থাৎ সামন্ত-তন্ত্রের যুগে রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার, তাদের দমন করার জন্য অভিজাতবর্গের সংস্থা এবং বর্তমান যুগে, অর্থাৎ ধনতন্ত্রের যুগে আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের যন্ত্র। আধুনিক দুনিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বুর্জোয়া শাসকদের মতে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই তথাকথিত "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সারবস্তুও' সেই মেহনতী জনগণের শোষণ ও নিপীড়ন। লেনিনের কথায় : "রাষ্ট্রের প্রভুত্বের নানান ধাঁচ হতে পারে—আলাদা ধাঁচে পুঁজির জোর আলাদা আলাদাভাবে দেখা দেয়—কিন্তু আসলে ক্ষমতা পুঁজির হাতেই থেকে যায়, তা সে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার হোক বা না হোক, কিংবা প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক হোক বা না হোক— আসলে প্রজাতন্ত্র যত বেশি গণতান্ত্রিক হয় পুঁজিবাদের শাসন ততই নগ্ন ও নির্লজ্জরূপে ফুটে ওঠে। দুনিয়াতে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তবু পুঁজির আধিপত্য, সারা সমাজের উপর মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোটিপতির আধিপত্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো এত নগ্ন ও এত খোলাখুলি ভাবে দুর্নীতি-পরায়ণ রূপ নেয়নি আর কোথাও"। ("রাষ্ট্র" প্রবন্ধ)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমেত সমস্ত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেই পুঁজিপতি শ্রেণীর তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিরাজ করে। এই প্রজাতন্ত্রে পুঁজিপতি শ্রেণীই অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণী ; জনগণকে শোষণ করে নিজেদের মুনাফার পাহাড় বানানোই তাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য তারা জনগণকে দাবিয়ে রাখার, দমন করার অভিযান চালায় এবং এই অভিযানে তারা রাষ্ট্রযন্ত্রকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে, তারা হয়ে ওঠে রাজনীতির ক্ষেত্রে আধিপত্যকারী শ্রেণী। তাই শোষণভরা সমাজে রাষ্ট্র হচ্ছে শোষক শ্রেণীর হাতে অন্য শ্রেণীদের দমন পীড়নের যন্ত্র। এক কথায় রাষ্ট্র হচ্ছে শোষকশ্রেণীর একনায়কত্ব। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির রূপ বহুবিচিত্র হলেও কিন্তু তাদের মর্মবস্তু একই। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই সব রাষ্ট্র একভাবে না একভাবে অবশ্যম্ভাবীরূপে বুর্জোয়াশ্রেণীরই একনায়কত্ব।

ধনতন্ত্রী সমাজের বিজ্ঞজনেরা (!) অবশ্য বলে থাকেন যে, পুঁজিবাদী প্রজাতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের যে-রূপ বিকশিত হয়ে উঠেছে তাতেই একথা

প্রমাণিত হচ্ছে যে রাষ্ট্র এখানে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিকাশের হাতিয়ার, এই রাষ্ট্রে আইনের চোখে সবাই সমান, এখানে সকলের সভা সমাবেশ করার, সংবাদপত্র প্রকাশের, নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা বিরাজ করছে।

এই সব বিজ্ঞজনের অভিমত যে সম্পূর্ণ ভুল তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মর্মবস্তু ব্যাখ্যা করলেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এই মর্মবস্তুটা কি ? এ প্রশ্নের উত্তর লেনিন এই ভাবে দিয়েছেন ঃ "বর্তমান রাষ্ট্রগুলির মূল আইন-কানুন ও তাদের শাসন ব্যবস্থা, সভা-সমিতির অধিকার, অথবা 'আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকই সমান'—এই কথা—এই সব যদি ধরেন তাহলে পদে পদে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভণ্ডামির প্রমাণ দেখতে পাবেন ; প্রত্যেক সৎ শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক এই ভণ্ডামির সঙ্গে পরিচিত। যত গণতান্ত্রিকই হোক না কেন, এমন কোনোও রাষ্ট্র নেই যে রাষ্ট্রের সংবিধানে এমন সব ফাঁক ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা নেই যাতে 'আইন ও শৃংখলার লংঘন' হলে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সৈন্য-বাহিনী নিয়োগ ও সামরিক আইন জারি করবার সুযোগ বুর্জোয়াশ্রেণীকে দেওয়া হয়নি—'আইন ও শৃংখলার লংঘন' মানে শোষিত শ্রেণী যদি তার দাসত্বের অবস্থা 'লংঘন' করে এবং অ-দাসসুলভ ব্যবহার করতে প্রয়াস পায়।" ("প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি" গ্রন্থ)।

শ্রমিকদের ন্যায়সংগত ধর্মঘট ভাঙার জন্য বুর্জোয়া শাসকেরা তো ধর্মঘটকে বে-আইনী ঘোষণা করে, সৈন্য প্রেরণ করে, আবার আইন করে ধর্মঘটের অধিকারও কেড়ে নেয়। আর আইন ও শৃংখলা রক্ষার নামে তারাই তো সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এই চিত্রই তো দেখা যায়। বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো পরিচালিত হয় বুর্জোয়া আমলাদের দ্বারা, বুর্জোয়া পার্লামেন্টের সদস্যদের দ্বারা, বুর্জোয়া বিচারকদের দ্বারা। সব দেশের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এই সত্যই তো উদ্ঘাটিত হয় যে, পুঁজিপতিদের কাছে "স্বাধীনতার" অর্থই হলো "সম্পত্তির পবিত্র অধিকারের" নামে বিত্তবানদের বিত্ত রক্ষা করার, আরও বিত্ত অর্জন করার স্বাধীনতা এবং বিত্তহীনদের, শ্রমিকদের অনশন মৃত্যুর স্বাধীনতা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে দিনের পর দিন ধনী আরও ধনী হয়, গরিব আরও গরিব হয়। জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্য, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা "গরিবী হটাও"র বুলি আওড়ান, আসলে কিন্তু তাঁরা জনগণকে শোষণ করে পুঁজিপতিদের আমিরী বাড়াবার কর্মনীতি অনুসরণ করে চলেন। পুঁজিপতিদের কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মানে হলো পত্র-পত্রিকাকে নানা কায়দায় ঘুষ দিয়ে কিনে নেবার স্বাধীনতা ; তথাকথিত জনমত তৈরি ও জনমত জাল করার জন্য টাকা ঢালবার স্বাধীনতা। পুঁজিপতিদের কাছে নির্বাচনে স্বাধীনভাবে ভোটের অধিকারের

মানে হলো নিজেদের শাসন কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ভোট কেনার, ভোটের কারচুপি করার, রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে সর্বজনীন ভোটাধিকারকে নস্যাৎ করে দেবার এবং প্রয়োজনবোধে সমগ্র নির্বাচনকেই সাজানো নির্বাচনে রূপান্তরিত করার অবাধ অধিকার। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, যখনই বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতায়, অর্থাৎ পুঁজির ক্ষমতায় অনিশ্চয়তার আভাস প্রত্যক্ষ করে তখনই তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব ও নিজেদের শ্রেণীর একনায়কত্বকে প্রকাশ্যে জাহির করে। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং মেহনতী জনগণকে দমন করার জন্য নিজেদের ঢাকঢোল পিটানো গণতন্ত্রকে জবাই করতে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে পদদলিত করতে তারা দ্বিধা করে না। যখন নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজন হয় তখন তারা সংসদীয় গণতন্ত্রকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় সামরিক একনায়কত্ব বা একেবারে নগ্ন বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতেও দ্বিধা করে না। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফ্যাসিজম—যার উগ্ররূপ প্রতিভাত হয়েছিল হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে আর মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইতালীতে। ফ্যাসিজমের অর্থ হলো এই যে চরম সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত পুঁজিবাদ তার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য আর উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আবরণে তার একনায়কত্বকে ঢেকে রাখতে পারছে না এবং প্রকাশ্যে হিংস্র, সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্বের রূপে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে এবং যে সব গণতান্ত্রিক রীতিনীতি আইন-কানুন, ন্যায় বিচারের ধ্বজা উড়িয়ে নিজের ভিত্তি, নিজের শোষণ ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদ এতদিন রক্ষা করে আসছিল সেই ধ্বজাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে সে উদ্যোগী হয়েছে।

তাই রাষ্ট্রের সারবস্তু হলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা, শ্রেণীশোষণ বজায় রাখার ব্যবস্থা, শ্রেণীগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এবং সেই আধিপত্য বলপ্রয়োগে কায়েম করে রাখার যন্ত্র।

এঙ্গেলসের কথায়ঃ "যেহেতু রাষ্ট্রের আবির্ভাব শ্রেণী বিরোধকে সংযত করবার প্রয়োজন থেকে, সেই সঙ্গে তার উদ্ভব হয় শ্রেণী বিরোধের মধ্যেই, সেজন্য রাষ্ট্র হলো সাধারণত সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র, এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর দমনে এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে।"

লেনিনের কথায়ঃ সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত পুঁজিপতিদের হাতে শ্রমজীবীদের দমন করবারই এক যন্ত্র মাত্র, পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বেরই এক উপকরণ, বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বেরই হাতিয়ার মাত্রঃ অন্যরকম কিছু কখনো হয়নি, হতে পারতও না। গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া

প্রজাতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ঘোষণা করা হয়, কিন্তু জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব প্রকাশ্যে বজায় থাকা পর্যন্ত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র তার ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতিকে কখনো কার্যে প্রয়োগ করতে পারে না।" (তৃতীয় আন্তর্জাতিক ও ইতিহাসে তার স্থান)।

আমাদের দেশের কংগ্রেসী শাসকেরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার বড় বড় কথা বলে থাকেন, গরিবী হটাবার নীতির কথাও তাঁরা বলেন। কিন্তু তাঁরা যে রাষ্ট্রের শাসক সে রাষ্ট্রের রূপটা কি? আমাদের দেশের রাষ্ট্র হলো বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্র। আমাদের দেশের রাষ্ট্রের এই হচ্ছে শ্রেণীচরিত্র। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ঃ "বর্তমান ভারত রাষ্ট্র বুর্জোয়াদের ও জমিদারদের শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র ; এর নেতৃত্বে আছে বৃহৎ বুর্জোয়ারা—ধনতান্ত্রিক বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে যারা ক্রমেই বেশি বেশি করে বিদেশী ফিন্যান্স মূল-ধনের সংগে সহযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। দেশের জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কার্যাবলী এই শ্রেণী চরিত্রের দ্বারাই মূলতঃ নির্ধারিত হয়ে থাকে।" (৫৬নং ধারা)।

আমাদের দেশে রাষ্ট্র হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন-শোষণের যন্ত্র, অর্থাৎ বুর্জোয়া ও জমিদারদের শাসন-শোষণের যন্ত্র। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ঃ "গোটা দেশের হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার জমিদার মিত্ররা অতীব সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ, কিন্তু জমি, মূলধন ও জীবিকা নির্বাহের সমস্ত উপকরণের উপর মালিকানার জোরে বুর্জোয়া ও তার জমিদার মিত্ররা শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর শাসন ও শোষণ চালিয়ে থাকে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি এবং তার সরকার গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টীয় ব্যবস্থায় সংখ্যা-গরিষ্ঠের দ্বারা নির্বাচিত হলেও—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মর্মবস্তুর দিক থেকে সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে।" (৬৬ নং ধারা)।

আমাদের দেশের রাষ্ট্র হচ্ছে বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত শাসনেরই একটি রূপ। এ রাষ্ট্রে যথারীতি উপরতলার শ্রেণীগুলি গণতন্ত্রের প্রসাদে পরিপুষ্ট হয়। এখানে "বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র ও সরকার এতকাল ধরে যে গণতন্ত্র কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আসছে, তা কার্যতঃ জনগণের ক্ষেত্রে অস্বীকৃত।' (৭৩ নং ধারা)।

রাষ্ট্রের এই শ্রেণী চরিত্রকেই কংগ্রেসী শাসকেরা সমাজতন্ত্রের ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু এরা জানে না যে, রাষ্ট্রের সারবস্তু সম্পর্কে মেহনতী জনগণ আজকের দিনে বেশ ওয়াকিবহাল।

৭

শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চালিকা শক্তি

সমাজে যেদিন থেকে শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে, সমাজ যেদিন থেকে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে সেদিন থেকেই অর্থাৎ আদিম কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার পর থেকেই চলছে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রাম। সমাজ বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন সমাজে এ সংগ্রাম বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে সত্য কিন্তু মূলধারাটি অপরিবর্তিতই রয়েছে—সেটি হলো শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রাম। এটই হলো শ্রেণী সংগ্রাম। দাস সমাজ ব্যবস্থায় এ সংগ্রাম ছিল দাস-মালিক আর দাসদের মধ্যে সংগ্রাম। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এ সংগ্রাম ছিল সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী আর ভূমিদাসদের মধ্যে সংগ্রাম। বর্তমানে অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এ সংগ্রাম হচ্ছে পুঁজিপতি আর শ্রমিকদের—বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সংগ্রাম।

সাধারণ কথায় শ্রেণী সংগ্রাম বলতে বুঝায় শোষক আর শোষিতের মধ্যে, উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক আর যাদের শ্রম করবার ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নেই সেই শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সংগ্রাম। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সংগ্রাম হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে সামন্ততন্ত্রের অবশেষ এখনো রয়ে গেছে সেখানে জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রামও হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম। তাই আমাদের দেশে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকের সংগ্রাম, জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম।

শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন ঃ "একথাগুলি সুবিদিত যে, একটা নির্দিষ্ট সমাজের কিছু লোকের কর্মপ্রচেষ্টার সংগে অন্য কিছু লোকের কর্মপ্রচেষ্টার সংঘাত দেখা দেয়। সামাজিক জীবন বিরোধে ভরা ; ইতিহাসে দেখা যায় শুধু জাতিতে জাতিতে ও সমাজে সমাজে সংগ্রাম নয়, জাতির অভ্যন্তরে, সমাজের অভ্যন্তরেও সংঘাত লাগে এবং উপরন্তু পালা করে দেখা দেয় বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়া, শান্তি ও যুদ্ধ, অচল অবস্থা ও দ্রুত প্রগতি অথবা অবক্ষয়ের পর্ব। এই আপাতদৃশ্যমান বিশৃংখলা ও গোলকধাঁধার মধ্যে নিয়ম-বদ্ধতা আবিষ্কার করার চাবিকাঠি মার্কসবাদই এনে দিয়েছে। সে চাবিকাঠি হলো শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব। (লেনিন ঃ কার্ল মার্কস প্রবন্ধ)।

বুর্জোয়া সমাজের তাত্ত্বিকেরা সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করেন না। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যখন তাঁদের অর্থনৈতিক তত্ত্ব

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জমি, পুঁজি ও শ্রমের কথা বলেন তখনই তাঁরা শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। জমির মালিক হচ্ছে জমিদার শ্রেণী, পুঁজির মালিক হচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণী আর শ্রমের মালিক হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষক। জমিদার আর কৃষকদের মধ্যে, পুঁজিপতি আর শ্রমিকদের মধ্যে সংঘাত, সংঘর্ষ ও সংগ্রামকে তারা অস্বীকার করেন না। নানা রকম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা শোষণকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করেন নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য। আসল শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না। মার্কস ও এঙ্গেলসই প্রথম শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তারা দেখিয়েছেন যে, "শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চালিকাশক্তি এবং বিশেষ করে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রাম আধুনিক সমাজ বিপ্লবের বিশাল চালক দন্ডস্বরূপ।" (বেবেল, লিবনেক্ত, ব্রাকে প্রমুখের কাছে মার্কস এঙ্গেলসের চিঠি—"সার্কুলার পত্র")।

মার্কস ও এঙ্গেলস "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে" শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখেছেন: "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস" (এঙ্গেলস পরে যোগ করেছেন, আদিম গোষ্ঠীগুলির ইতিহাস, অর্থাৎ জমির উপর যৌথ মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতি সমাজের ইতিহাস এর মধ্যে পড়ে না)।

"স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ডকর্তা আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যে; প্রতিবারই এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সকলের ধ্বংস প্রাপ্তিতে।......

"সামন্তসমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণী বিরোধ শেষ হয়ে যায়নি। এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরন।

"আমাদের যুগে অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কিন্তু এই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে: শ্রেণী-বিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি বিশাল শত্রু শিবিরে ভাগ হয়ে পড়ছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন দুই বিরাট শ্রেণীতে—বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত।"

মহান ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পর থেকে ইউরোপের ইতিহাস একাধিক দেশে অতি পরিষ্কারভাবে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে ঘটনা-স্রোতের এই আসল অন্তর্বস্তুটিকে—শ্রেণীসংগ্রামকে। মানব সমাজের গতিধারা বোঝার চাবিকাঠি

যে শ্রেণীসংগ্রাম তা-ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে উনিশ শতকের ইউরোপের দেশে দেশে অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের মধ্য দিয়ে এবং বিশ শতকে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবে ও ১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। শ্রেণীসংগ্রামই যে ঘটনাধারার ইঞ্জিন তা-ই মূর্ত হয়ে উঠেছে মহান চীন বিপ্লবে— ১৯২৭-এ তার সূচনা আর ১৯৪৯-এ সে-বিপ্লবের সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণীসংগ্রামেরই পরিণতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশে ও আমেরিকা মহাদেশের পাদদেশে কিউবা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা শ্রেণী সংগ্রামেই ফল। সমাজ-বিকাশের ধারায় শ্রেণীসংগ্রামের এই ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শোষক আর শোষিতের মধ্যে বিরাজ করছে যে সামাজিক দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব থেকেই গড়ে ওঠে শ্রেণীসংগ্রাম। সমাজে শোষিত শ্রেণীগুলিকে যেভাবে জীবন যাপন করতে হয়, শোষকের হাতে তাদের যেভাবে নির্যাতিত হতে হয় তাই তাদের বিপ্লবী কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বুর্জোয়া তত্ত্ববিদেরা মাঝে মাঝে বলে থাকেন যে, সমাজে বিরোধী শ্রেণী শক্তিগুলির স্বার্থকে খাপ খাওয়ানো যেতে পারে, শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্য নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত পরিহার করে তাদের স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে। শ্রেণী স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানের প্রবক্তরা শ্রমিক-কৃষককে সংগ্রামের পথ পরিহার করতে বলেন, পুঁজিপতি আর জমিদারদের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর, তাদের শুভ-বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে বলেন।

শ্রেণীস্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে হয় শোষকশ্রেণীকে স্বেচ্ছায় উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর তার ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়তে হবে, নয় শোষিত শ্রেণীকে তার নির্যাতিত অবস্থা মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হবে, বুর্জোয়া তত্ত্ববিদেরা শোষিত শ্রেণীকে এই উপদেশই দিয়ে থাকে। কিন্তু এ দুটোর একটাও বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, সমাজের বিকাশ যে স্তরেই থাক না কেন, কোন স্তরেই উৎপাদনের উপায় সমূহের যারা মালিক তারা স্বেচ্ছায় কখনো তাদের মালিকানা ছেড়ে দেয় না, দিতে পারে না এবং দেবেও না। অন্যদিকে আবার এটাও ঘটনা যে, শোষিত শ্রেণী নীরবে চিরকাল এই শোষণ ব্যবস্থা, নিজেদের এই দুঃখদুর্দশার অবস্থা মেনে চলবে না, চলতে পারে না—এই শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা লড়াই করে, তারা বাঁচার তাগিদেই প্রতিদিন লড়াই করে শোষণের প্রত্যেকটি ব্যবস্থার, রূপের বিরুদ্ধে। তাই এই দুই শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম

অনিবার্য হয়ে ওঠে। শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমেই শোষকদের হাত থেকে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা কেড়ে নেওয়া যেতে পারে এবং মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যেতে পারে।

কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামই কি মার্কসের তত্ত্বের মূল কথা? না, তা নয়। মার্কসের তত্ত্বের মূল কথা হলো: শ্রেণীসংগ্রামের আবশ্যিক পরিণতি শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মার্কসের পূর্বে বুর্জোয়ারা শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলেছেন। মার্কসের নিজের কথায়: "নিজের পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি, আধুনিক সমাজে শ্রেণী বা শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব আবিষ্কার করার কৃতিত্ব আমার নয়। আমার বহু পূর্বে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এই শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ বর্ণনা করেছেন এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা শ্রেণী সমূহের অর্থনৈতিক অঙ্গ-সংস্থান (গঠন) বর্ণনা করেছেন। নতুনের মধ্যে আমি শুধু নিম্নলিখিত বিষয়ই প্রমাণ করেছি:

"(১) উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গেই কেবল শ্রেণী সমূহের অস্তিত্ব বিধৃত;

"(২) শ্রেণী সংগ্রামের আবশ্যিক পরিণতি শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব;

"(৩) যে-অবস্থায় শ্রেণী সমূহের বিলোপ ঘটবে, এই একনায়কত্ব হচ্ছে সেই অবস্থায় উত্তরণের পর্যায় মাত্র।" (১৮৫২ সালের ৫ই মার্চ হেবডেমেয়ারের নিকট লেখা মার্কসের পত্র)

মার্কসের এই বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, শ্রেণীসংগ্রামের আবশ্যিক পরিণতি হলো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এবং শ্রেণীহীন সমাজ পত্তন না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব চলতে থাকবে। শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে, তাঁদের ভিতর সংঘাত, সংগ্রামও চলবে অর্থাৎ শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের আমলেও শ্রেণীসংগ্রাম চলবে।

শ্রেণীসংগ্রামের এই আবশ্যিক পরিণতি শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কেই বুর্জোয়া শ্রেণীর ভয়। তাই তথাকথিত বহু মার্কসবাদী (!) তত্ত্ববিশারদ বুর্জোয়াদের কাছে মার্কসবাদ গ্রহণযোগ্য করার আশায় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে বাদ দিয়ে শুধু শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকেই মার্কসবাদ বলে চালাবার চেষ্টা করেন। আসলে এরা মার্কসবাদকেই বিকৃত করেন।

মার্কসের এই চিঠির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছিলেন: "যে শুধু শ্রেণী-সংগ্রামই স্বীকার করে, সে যথার্থ মার্কসবাদী হয়ে উঠতে পারেনি, বুর্জোয়া-সুলভ যুক্তি ও রাজনীতির গণ্ডি সে অতিক্রম করতে পারেনি। শ্রেণী সংগ্রামের মতবাদের মধ্যে মার্কসবাদকে সীমাবদ্ধ করে রাখার অর্থ হচ্ছে মার্কসবাদের অঙ্গচ্ছেদ করা, মার্কসবাদকে বিকৃত করা, বুর্জোয়াদের গ্রহণযোগ্য একটা কিছুতে

মার্কসবাদকে পর্যবসিত করা। সেই ব্যক্তিই মার্কসবাদী যে শ্রেণী সংগ্রামের স্বীকৃতি থেকে আরো অগ্রসর হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে। একজন মার্কসবাদী ও একজন সাধারণ ক্ষুদে কিংবা বড়ো বুর্জোয়ার মধ্যে গভীর পার্থক্য এখানেই। মার্কসবাদকে যথার্থ উপলব্ধি ও স্বীকার কেউ করতে পেরেছে কি না, তা এই কষ্টিপাথরেই যাচাই করতে হবে।" (রাষ্ট্র ও বিপ্লব)

লেনিন অন্যত্র বলেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন হয়—

—"বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য ;

—"প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে সন্ত্রাস সঞ্চারের জন্য ;

—"বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ;

—"শ্রমিকশ্রেণী যাতে তার শত্রুদের সবলে দাবিয়ে রাখতে পারে তার জন্য।" (লেনিন ঃ প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউৎস্কি।)

লেনিনের এই বক্তব্যের সার কথা হলো যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করবার প্রয়োজনীয়তা থাকে। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও শ্রেণীসংগ্রাম চালাতে হবে। মনে রাখা দরকার যে প্রলেতারীয় বিপ্লব সফল হওয়ার সংগে সংগে শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি ঘটে না। সেগুলি সমাজে বিরাজ করতে থাকে এবং তাদের অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থাও বেশ কিছুকাল বজায় থাকে এবং সর্বদাই পুরনো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিপদ থেকে যায়। সুতরাং ক্ষমতা দখলের সংগে সংগেই শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের অবসান ঘটে না ; শ্রেণীহীন সমাজ—কমিউনিস্ট সমাজ—প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত শ্রেণী সংগ্রাম চলতে থাকে। তবে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয় নতুন পরিবেশে এবং এ সংগ্রাম নতুন রূপও ধারণ করে। এই নতুন জিনিস হলো যে, শ্রমিকশ্রেণী এখন "শাসক শ্রেণীরূপে সংগঠিত।" আর যারা এতদিন শাসক শ্রেণী ছিল সেই বুর্জোয়ারা পরাজিত হয়েও তাদের প্রতিরোধকে সুতীব্র করে তুলছে। এই পরাজিত বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই তখন চলে শাসক শ্রেণীরূপে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম। তাই শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব শ্রেণী সংগ্রামের শেষ নয়, এ হলো নবরূপে শ্রেণী সংগ্রামের অনুবৃত্তি।

৮

সমাজ-বিপ্লবের কথা

১৮৫৯ সালে "অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা" (Zurkritique) গ্রন্থের ভূমিকায় মার্কস লিখলেন ঃ

"বিকাশের একটি বিশিষ্ট স্তরে সমাজের বাস্তব উৎপাদিকা শক্তির সংগে বিরাজমান উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ ঘটে। কিংবা ঐ একই ব্যাপারকে আইনের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে যে সম্পত্তি সম্পর্কের গন্ডিতে উৎপাদিকা শক্তি এতদিন সক্রিয় ছিল তারই সংগে বিরোধ বাধে। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের বিভিন্ন রূপ থেকে এখন এই সম্পর্কগুলি সে-শক্তির শৃংখলে পরিণত হয়। তখন আরম্ভ হয় সমাজ বিপ্লবের যুগ।"

কিন্তু সমাজ বিপ্লব বলতে কি বুঝায়? আমরা ধনতন্ত্রী সমাজে বাস করছি। এর আগে ছিল সামন্ত সমাজ, তার আগে ছিল দাস সমাজ, তারও আগে ছিল আদিম যৌথ সমাজ। এই আদিম যৌথ সমাজের পর থেকে "মানব জাতির সমগ্র ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস" (মার্কস ও এংগেলস—কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো)। সমাজ বিকাশ লাভ করেছে এক একটি স্তরের মধ্য দিয়ে এবং তার প্রতিটি স্তরেই সুনির্দিষ্ট এক ধরনের সম্পত্তি সম্পর্ক আধিপত্য করেছে। সমাজের এই বিকাশ ধীর স্থির গতিতে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে, বিনা বিরোধে, বিনা সংগ্রামে ঘটেনি—পুরানো ব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করেই নতুন ব্যবস্থা সমাজে প্রবর্তিত হয়েছে। অগ্রগতির পথে সমাজ অগ্রসর হয়েছে। বিপ্লবের ধারায়ই নতুন সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে এবং এই আবির্ভাব ঘটেছে শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে।

সমাজের অগ্রগতির পথে এক ধরনের সমাজ থেকে আর এক ধরনের সমাজের আবির্ভাব ঘটেছে বিপ্লবের মাধ্যমে এবং এটাই হচ্ছে সমাজ বিপ্লব।

উৎপাদিকা শক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধই হচ্ছে সমাজ বিপ্লবের অর্থনৈতিক ভিত্তি। উৎপাদিকা শক্তির সংগে সামঞ্জস্য রেখেই উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের একটা স্তরে দেখা যায় যে, উৎপাদিকা শক্তির নতুন রূপের সংগে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের আর সামঞ্জস্য নেই। তখন ঐ উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তখনই উৎপাদিকা শক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে। এই বিরোধ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। এই বিরোধের সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় সমাজের সেই স্তরের উৎপাদন সম্পর্কের অর্থাৎ সম্পত্তি সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন এবং এ পরিবর্তন ধীরে ধীরে বিবর্তনের ধারায়

আদৌ সম্ভব নয়, কেন না এই উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে অর্থাৎ, সম্পত্তি সম্পর্কের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শাসকশ্রেণীর হাতে রয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য, নিজেদের সম্পত্তি সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তারা এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। সেই জন্যই উৎপাদিকা শক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের এই বিরোধের সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় বিপ্লবের। এই বিপ্লব মূর্ত হয়ে ওঠে শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে। তাই সমাজ বিপ্লবের মূল কথা হলো এক শ্রেণীর শাসনের পরিবর্তে আর এক শ্রেণীর শাসনের প্রবর্তন।

উৎপাদিকা শক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধের দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের চোখের সামনেই দেখছি ধনতন্ত্রী দেশগুলির অর্থনৈতিক সংকটে। এই সংকট পালা করেই আসে এবং প্রতিবারই তা পূর্বের চেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দেয়। পুঁজিপতিরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলে, নষ্ট করে ফেলে, উৎপাদন বন্ধ করে দেয় এবং যে-সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজের অভাবে, খাদ্যের অভাবে হাহাকার করে সেই সময়ে উৎপাদিকা শক্তিকে পঙ্গু করে দেয়। লোকে যে হাহাকার করে তার কারণ পণ্যের অভাব নয়, অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনই তার কারণ। এ থেকে যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটি হলো উৎপাদনের উপায় সমূহের উপর পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মালিকানা অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্ক আর উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। এক কথায় মালিকানার বুর্জোয়া সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই বিকশিত উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, এগুলি শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে—এ শৃঙ্খল না ভাঙলে সমাজের অগ্রগতি অসম্ভব। এ শৃঙ্খল ভাঙার জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সমাজ-বিপ্লব।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটাই আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেকটি শাসক, শোষকশ্রেণী শেষ স্তর পর্যন্ত সেই সমাজে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ সম্পত্তি সম্পর্ককে বজায় রাখার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে, এবং তার জন্য লড়াই করেছে। কেননা এই সম্পর্ক বজায় রাখার উপরই নির্ভর করছে তাদের ঐশ্বর্য, প্রভাব প্রতিপত্তি, সর্বোপরি শ্রেণী হিসাবে তাদের অস্তিত্ব। বেশ কিছুকাল তারা নিজেদের ঐশ্বর্য, প্রভাব প্রতিপত্তি, শাসকশ্রেণী হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে কেননা তাদের হাতে রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতা। কোনো শাসকশ্রেণীই স্বেচ্ছায় এই রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দেয়নি এবং এই রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখার জন্য কঠোর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতেও দ্বিধা করেনি, কেননা এ সংগ্রাম হলো তাদের জীবন মরণের সংগ্রাম। তাই সমাজের বর্তমান উৎপাদন সম্পর্কের উচ্ছেদ সুসম্পন্ন হতে পারে কেবলমাত্র শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে এবং সেটাই হচ্ছে সমাজ বিপ্লব।

অন্যদিকে আবার এটাই দেখা গেছে যে, যাদের স্বার্থ বর্তমান উৎপাদন সম্পর্কের অবসানের সঙ্গে এবং নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত, যাদের স্বার্থ উৎপাদিকা শক্তির আরো বিকাশের সঙ্গে যুক্ত তারা শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত শাসকশ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। এরা সবাই আবার একই শ্রেণীর লোক নয়, এরা বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ১৭৮৯ সালের মহান ফরাসি বিপ্লবে সামন্ততান্ত্রিক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণী, প্রলেতারিয়েত শ্রেণী আর কৃষক সমাজ এবং এ বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। ১৯১৭ সালের রুশ দেশের মহান নভেম্বর বিপ্লবে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল শ্রমিক শ্রেণী, আর কৃষককুল এবং এ বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল শ্রমিক শ্রেণীর হাতে।

সমাজের বিকাশের ধারায়ই অর্থনৈতিক কাঠামোতে চূড়ান্ত বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এই পরিবর্তনের পথ প্রস্তুত হয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে—উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি ও নতুন উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের অসামঞ্জস্যতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই সব পরিবর্তন বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করা হয় রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সমস্যা যাই উঠুক না কেন এবং সংগ্রাম যে রূপেই গ্রহণ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষই অর্থনৈতিক বিরোধ এবং শ্রেণীবিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সংগ্রাম করে, এই বিরোধের অবসান ঘটায়। তারাই ঘটায় বিপ্লব এবং সেটাই হলো সমাজ বিপ্লব।

তাই সমাজ বিপ্লব হচ্ছে পুরনো শ্রেণীর, প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর, যারা পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক জিইয়ে রাখতে চায় এবং কোনো রকম পরিবর্তনের বিরোধিতা করে সেই শ্রেণীর কাছ থেকে উদীয়মান নতুন শ্রেণীর কাছে রাষ্ট্র ক্ষমতার হস্তান্তর। "রাষ্ট্র ক্ষমতার কথাটিই হলো প্রত্যেকটি বিপ্লবের মূল কথা।" (লেনিন)

বিপ্লবের অর্থ হলো যারা বর্তমান উৎপাদন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চায় সেই শাসক শ্রেণীর উচ্ছেদ এবং যারা নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী সেই শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল।

এই বিচারে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান বিপ্লব নয়। জার্মানিতে হিটলার কর্তৃক ক্ষমতা দখল বিপ্লব নয়, কেননা হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও জার্মানিতে শাসক শ্রেণী হিসাবে পুঁজিপতিরাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। পরিবর্তন হয়েছিল কেবলমাত্র শাসনের ধারায়—পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের জায়গায় স্থাপিত হয়েছিল প্রকাশ্য পুঁজিবাদী সন্ত্রাসের শাসন, বুর্জোয়াদের নগ্ন একনায়কত্ব।

প্রত্যেকটি বিপ্লবই হচ্ছে বর্তমান উৎপাদন সম্পর্ক অবসান করার এবং নতুন উৎপাদিকা শক্তির উপযোগী নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ার অভিযান। বিপ্লব বর্তমান উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ সম্পত্তি সম্পর্ক ধ্বংস করে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপন করে।

উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা সম্পর্ককেই সাধারণ কথায় সম্পত্তি সম্পর্ক বলা হয়ে থাকে। তাই সম্পত্তি সম্পর্কের উচ্ছেদের কথা শুনলেই মুক্ত গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা শিউরে উঠেন এবং বলতে আরম্ভ করেন যে, কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করতে চায়। এ চিৎকার নতুন কিছু নয়, মার্কস-এঙ্গেলসের সময়েও বুর্জোয়ারা এ রকম চিৎকারই করতো। তাদের উদ্দেশ্যে "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"তেই মার্কস-এঙ্গেলস লিখেছিলেন "প্রচলিত মালিকানা সম্পর্কের উচ্ছেদ মোটেই কমিউনিস্টদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সমস্ত মালিকানা সম্পর্কেও ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া মালিকানার অনুকূলে সামন্ত সম্পত্তির উচ্ছেদ করেছে। সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। কিন্তু শ্রেণীবিরোধের উপর, অল্প লোকের দ্বারা বহুজনের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ও উৎপন্ন দখলি ব্যবস্থার চূড়ান্ত ও পূর্ণতম প্রকাশ হলো বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানা। এই অর্থে কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে: "ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।"

কমিউনিস্টদের এই তত্ত্ব যে সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত হয় সেটা হচ্ছে প্রলেতারীয় বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যার প্রথম আবির্ভাব আমরা দেখি রুশ দেশে ১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর বিপ্লবে। মানবজাতির ইতিহাসে আগে যে সব বিপ্লব ঘটেছে সেগুলির সঙ্গে এ বিপ্লবের ছিল বিরাট পার্থক্য। অতীতের সমস্ত বিপ্লবেই একদল শোষকের শাসন কর্তৃত্বের অবসান করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর একদল শোষকের শাসন কর্তৃত্ব। সে সব বিপ্লবে শুধু একদল শোষক আর একদল শোষককে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল, কিন্তু জনগণকে শোষণ করার প্রথা অপরিবর্তিতই ছিল। এভাবেই দাস-সমাজব্যবস্থার জায়গায় এসেছিল সামন্ত ব্যবস্থা, আবার সামন্ত ব্যবস্থার জায়গায় এসেছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। যে বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। এ রকম বিপ্লবই ঘটেছিল ১৭৮৯ সালে ফরাসি দেশে—সে বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। সেদিন বুর্জোয়া শ্রেণীই দখল করেছিল রাষ্ট্রক্ষমতা, প্রবর্তন করেছিল নয়া শোষণ ব্যবস্থা, মজুরি দাসত্ব ব্যবস্থা। কিন্তু ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রুশ দেশে যে মহান বিপ্লব

ঘটলো সে বিপ্লব ছিল প্রলেতারীয় বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। একদল শোষকের জায়গায় আর একদল শোষককে বসানো, এবং এক রকম শোষণের পরিবর্তে আর এক রকম শোষণের প্রবর্তন করা সে বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল না। সে বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের সকল রকম শোষণের অবসান করা, সমস্ত শোষক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা, শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে যারা সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী সেই শ্রমিক-শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, উৎপাদনের উপায়সমূহকে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে সমাজ-বিপ্লবের ধারা।

৯

সমাজ বিপ্লবের চালিকা শক্তি

ইতিহাসে আমরা বিভিন্ন ধরনের সমাজ বিপ্লব দেখছি। এইসব সমাজ বিপ্লবের চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, পার্থক্য রয়েছে এইসব বিপ্লবের চালিকা শক্তির মধ্যে। সমাজ বিপ্লবের চরিত্র বলতে আমরা কি বুঝি? সমাজের যে দ্বন্দ্বগুলি এই বিপ্লব সমাধান করবে তার সারমর্ম এবং যে সমাজ-ব্যবস্থা এই বিপ্লব প্রবর্তন করবে তার রূপ দিয়ে সমাজ-বিপ্লবের চরিত্র নির্ধারিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, আর ১৯১৭ সালের রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লবের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের চরিত্রটা ছিল বুর্জোয়া চরিত্র, কেন না এই বিপ্লবের করণীয় কাজ ছিল সামন্ত-তান্ত্রিক সম্পত্তি সম্পর্কের অবসান করে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথের শৃংখল ভেঙে ফেলা এবং পুঁজিপতি সম্পত্তি সম্পর্ক বা বুর্জোয়া সম্পত্তি সম্পর্ক, এক কথায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ১৯১৭ সালের রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লবের চরিত্রটার ছিল অন্য রূপ, এই বিপ্লবের চরিত্রটা ছিল প্রলেতারীয় চরিত্র। এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কের অবসান করে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে নব নব পথ উন্মুক্ত করা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এই বিপ্লবের ছিল সমাজতান্ত্রিক চরিত্র।

বিপ্লবের চালিকা শক্তি হচ্ছে সেই শ্রেণীগুলি যারা বিপ্লব ঘটায়, বিপ্লবের লক্ষ্য সাধনের জন্য লড়াই করে। বিপ্লবের চালিকা শক্তি শুধু বিপ্লবের চরিত্রের উপরই নির্ভর না, যে বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থায় এই বিপ্লব কার্যকর করা

হয় সেই বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থার উপরও বিপ্লবের চালিকা শক্তি নির্ভর করে। এই কারণেই একই ধরনের, একই চরিত্রের বিপ্লবে আমরা বিপ্লবের চালিকা শক্তির বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে যে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটেছিল সেইসব বিপ্লবে আমরা দেখি যে, শুধু বুর্জোয়ারাই বিপ্লবের চালিকা শক্তি নয়। কৃষক কুল, পেটি বুর্জোয়ারা এবং শহরের গরিব লোকেরাও ছিল এই সব বুর্জোয়া বিপ্লবের চালিকা শক্তি। এইসব বিপ্লবের নেতৃত্বে বুর্জোয়ারাই ছিল। কিন্তু পরবর্তী-বুর্জোয়া বিপ্লবে, (যাকে বলা হয়ে থাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব) বিপ্লবের চালিকা শক্তির নতুন রূপ প্রত্যক্ষ করা গেলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেখা গেলো যে, রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের দখলে আসার পর বুর্জোয়ারা জনগণের বিপ্লবী শক্তির বিকাশ দেখে শংকিত হয়ে উঠলো, যে গণতন্ত্রের ধ্বজা তারা উড়িয়েছিল সেই গণতন্ত্রের বিকাশের পথেই তারা প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়ালো। এখন বুর্জোয়া বিপ্লবের করণীয় কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব এসে পড়লো শ্রমিক শ্রেণীর উপর: সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার সমস্ত শৃঙ্খল চূর্ণ করা, ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, ঝেঁটিয়ে বিদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো শ্রমিক শ্রেণীকে। ১৯০৫ সালের এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির বা মার্চের রুশ বিপ্লবই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমাজ বিপ্লবের দিক থেকে সে বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সে বিপ্লবকে সফল করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হলো আর সে-বিপ্লবের চালিকা শক্তি ছিল শ্রমিক ও সমগ্র কৃষক।

পুরানো সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলদের উচ্ছেদ করার জন্য বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। প্রলেতারিয়েত (শ্রমিক শ্রেণীর) রাষ্ট্রক্ষমতা দখল না করা পর্যন্ত বিপ্লব চালিয়ে যাওয়াই হলো শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য। এই শিক্ষাই মার্কস-এঙ্গেলস দিয়েছেন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মধ্য দিয়ে। মার্কস-এঙ্গেলসের এই শিক্ষাকে সাম্রাজ্যবাদের যুগে নতুন বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থায় বিকশিত করলেন এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করলেন লেনিন।

লেনিন শ্রমিক শ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, এ যুগে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে হলে, সমাপ্ত করতে হলে এ বিপ্লবের নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীকেই গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিক শ্রেণীকে তার প্রধান মিত্র হিসাবে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়কেই সমাবেশ করতে হবে; আর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের ফল হিসাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় বুর্জোয়া

শ্রেণীকে অধিষ্ঠিত করা হবে না। রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে নিতে হবে। লেনিন সেই রাষ্ট্র ক্ষমতার সংজ্ঞা দিলেন "শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব"। মার্কসবাদী চিন্তাধারায় লেনিন নতুন ধারার সংযোজনা করলেন। সেটি হলো ঃ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোস্যাল ডেমোক্রাসির দুই কৌশল" গ্রন্থেই লেনিন তাঁর এই নতুন তত্ত্ব বিবৃত করলেন।

লেনিনের এই বক্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে স্তালিন লিখলেন ঃ পূর্বের পরিস্থিতি ছিল এই যে, বুর্জোয়া বিপ্লবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইউরোপে, বুর্জোয়া শ্রেণী প্রধান ভূমিকায় নামতো। প্রলেতারিয়েত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বুর্জোয়াদের পিছনে পিছনে চলতো এবং কৃষকেরা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রয়োজন মতো ব্যবহারের মজুদ শক্তি থাকতো। মার্কসবাদীরা মনে করতো যে এরকম যোগাযোগ অল্পাধিক অনিবার্য, আর সংগে সংগে এ কথা জুড়ে দিত যে শ্রেণী হিসাবে জরুরী দাবি-গুলির জন্য প্রলেতারিয়েতকে যথাসম্ভব সংগ্রাম করতেই হবে এবং নিজের রাজনৈতিক পার্টি গড়তে হবে। লেনিন বললেন যে, এখন ইতিহাসের নতুন পর্যায়ে পরিস্থিতি এমনভাবে বদলাচ্ছে যে, প্রলেতারিয়েতই বুর্জোয়া বিপ্লবের চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে, বিপ্লবের নেতৃত্ব থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ঠেলে ফেলা হচ্ছে এবং কৃষক সম্প্রদায় প্রলেতারিয়েতের মজুদ শক্তি হয়ে উঠেছে। (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি'র ইতিহাস)।

আজকের দিনে বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা হওয়া তো দূরের কথা, তার চালিকা শক্তি হিসাবেও কাজ করতে পারে না। রুশ দেশের ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের মার্চের গণতান্ত্রিক বিপ্লবেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে—সে বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষককুল দ্বারা। অনুরূপ চিত্রই আমরা দেখি ভিয়েতনামের বিপ্লবের ক্ষেত্রে। ভিয়েতনামের ১৯৪৫-এর বিপ্লব ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লব—নতুন স্টাইলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সে-বিপ্লব সফল হয়েছিল। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব জনগণের দ্বারা এই বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল।

আমাদের দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আজ অসমাপ্ত। এই অসমাপ্ত বিপ্লব সমাপ্ত করার দায়িত্ব এসে পড়েছে শ্রমিক শ্রেণীর উপর। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ঃ "বিকাশের বর্তমান স্তরে আমাদের বিপ্লবের প্রকৃতি মূলতঃ সমান্ততন্ত্র-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়াবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক। অবশ্য যখন বিভিন্ন দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তখনকার গতানুগতিক অর্থে

এটা গণতান্ত্রিক হতে পারে না। আমাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যে যুগে শ্রমিক শ্রেণী আর তার রাজনৈতিক দলের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ অবধারিত। শ্রমিক শ্রেণী আর তার রাজনৈতিক দল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেবে না ; কারণ বুর্জোয়া শ্রেণী মাঝপথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্র অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবার আবশ্যিক সোপান হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীকেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব করতে হবে। তাই এটা বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত পুরনো ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। এ হচ্ছে নতুন ধরনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব যা সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে।" (৯৬ নং ধারা)

আমাদের এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান বাহিনী হলো শ্রমিক শ্রেণী আর আশু মজুদ বাহিনী হলো ঃ (ক) সমগ্র কৃষক—ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষক, মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষক ; (খ) শহরের মধ্যবর্তী শ্রেণী ও অন্যান্য মধ্যবর্তী শ্রেণী।

সুতরাং আমাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরও চালিকা শক্তি হলো শ্রমিক শ্রেণী, সমগ্র কৃষক আর মধ্যবর্তী শ্রেণী।

১০

বুর্জোয়া শ্রেণী

দুটো শ্রেণী আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত। বুর্জোয়ার পতন আর প্রলেতারিয়েতের বিজয়—এ হচ্ছে অনিবার্য। ইতিহাসের এই হচ্ছে নির্দেশ। কিন্তু এই বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত বলতে কি বুঝায় ? বুর্জোয়া বলতে আমরা বুঝি ধনিক শ্রেণী, আর প্রলেতারিয়েত বলতে বুঝি শ্রমিক শ্রেণী।

আজকের দিনে যে-সমাজে আমরা বাস করছি সে সমাজ হচ্ছে ধনতন্ত্রী সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ। এ সমাজের উপরতলার মানুষ হচ্ছে ধনিকেরা, পুঁজিপতিরা। এদেরই বলা হয় বুর্জোয়া। প্রলেতারিয়েতের অর্থাৎ শ্রমিকের হাতে যা নেই, বুর্জোয়াদের হাতে তা-ই আছে। সামাজিক উৎপাদনের উপায়-গুলি থেকে প্রলেতারিয়েতেরা বঞ্চিত, এগুলি বুর্জোয়াদের কুক্ষিগত। বেঁচে থাকার জন্য, জীবনধারণের জন্য প্রলেতারিয়েতেরা তাদের শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য হয়— তারা তাদের শ্রমশক্তি বেচে কলকারখানার মালিকদের কাছে, পুঁজিপতিদের

কাছে, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের কাছে। নিজেদের ঐশ্বর্য বাড়াবার জন্য, মুনাফা লুটবার জন্য বুর্জোয়ারা প্রলেতারিয়েতের শ্রমশক্তি কেনে এবং সেই শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে প্রলেতারিয়েতের রক্ত শুষে নেবার জন্য। বুর্জোয়ারা হচ্ছে বর্তমান সমাজে সামাজিক উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিক এবং মজুরি-শ্রমের নিয়োগ কর্তা। প্রলেতারিয়েতরা শোষিত হয়, শাসিত হয়—তারা হচ্ছে শোষিত শ্রেণী, শাসিত শ্রেণী। এদের যারা শোষণ করে এবং শাসন করে তারাই হচ্ছে বুর্জোয়া। বুর্জোয়ারা হচ্ছে শোষক শ্রেণী, শাসক শ্রেণী। ধনতন্ত্রী সমাজে এদেরই হাতে থাকে রাষ্ট্রক্ষমতা। তারই দৌলতে এরা শাসন-শোষণ চালায়। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা বলে থাকি যে, ভারতের বর্তমান রাষ্ট্র বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্র। কাজেই বুর্জোয়া কথাটির সঙ্গে আমরা বেশ পরিচিত।

কিন্তু বুর্জোয়া কথাটির উৎস কি থেকে, আর শ্রেণী হিসাবে এর বিকাশের ধারাই বা কি? জার্মান শব্দ "বার্গ" থেকে বুর্জোয়া কথাটির উৎপত্তি। "বার্গ"-এর অর্থ হলো দুর্গ বা শহর। ইওরোপে মধ্যযুগে যাদের বার্গার বলা হতো তারা ছিল শহরের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও হস্তশিল্পের মালিক সম্প্রদায়। নিজেদের টিকে থাকার জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হতো সামন্ততন্ত্রের-জমিদারদের বিরুদ্ধে। তাদেরই উত্তরসাধক হচ্ছে আধুনিক জগতের শিল্পপতিরা। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এই শিল্পপতিরা অন্যান্য বিত্তশালী শ্রেণীগুলিকে নিজেদের নেতৃত্বাধীনে নিয়ে এসেছে। এরাই ঐ সব দেশের শাসকশ্রেণী এবং এদেরই বলা হয় বুর্জোয়া শ্রেণী।

বুর্জোয়াশ্রেণীর এই বিকাশের ধারা সম্বন্ধে এঙ্গেলস লিখেছেন: "মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকগোষ্ঠীগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি—এরা নিজেদের প্রয়োজনের প্রায় সবটা নিজেরাই উৎপন্ন করতো। প্রায় কোন রকম বিনিময় ব্যবস্থাই তাদের ছিল না; আর অস্ত্রধারী অভিজাত শ্রেণীর কাছ থেকে এরা পেত বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা-ব্যবস্থা এবং জাতীয় অথবা অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক সংহতি। যখন শহর গড়ে উঠলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠলো স্বতন্ত্র হস্তশিল্প আর প্রথমে অভ্যন্তরীণ ও পরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, তখন শহরে বুর্জোয়াশ্রেণীও বিকাশ লাভ করলো এবং মধ্যযুগের অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রামে এই বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায় হিসাবে নিজেরও জায়গা করে নিলো। কিন্তু ইওরোপের বাইরের জগৎ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই বুর্জোয়াশ্রেণীর বাণিজ্যের এলাকা অনেকখানি বেড়ে গেল। আর সেই সঙ্গে তাদের শিল্প বিকাশে এলো এক নতুন প্রেরণা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব শাখায় হস্ত শিল্পের জায়গায় এবার এলো কারখানা ধরনের শিল্প এবং তারও জায়গা নিল বৃহদায়তন শিল্প। গত শতাব্দীর (অষ্টাদশ শতাব্দীর—লেখক) বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে, বিশেষত বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে এটা সম্ভব হয়ে উঠলো। বৃহদায়তন শিল্পেরও প্রভাব পড়লো বাণিজ্যের উপর ; অনুন্নত দেশগুলি থেকে পুরনো কায়িক পরিশ্রম বিতাড়িত হলো, আর অধিকতর বিকশিত দেশগুলিতে গড়ে উঠলো আজকের দিনের নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা—বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, রেলপথ ও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ। এভাবেই বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমেই বেশি করে সামাজিক সম্পদ ও সামাজিক ক্ষমতা নিজের হাতে জমাতে থাকলো, যদিও রাজনৈতিক ক্ষমতা তখনো ছিল অভিজাত শ্রেণীর এবং তাদের সমর্থিত রাজতন্ত্রের হাতে এবং সেই ক্ষমতা থেকে বুর্জোয়ারা ছিল বঞ্চিত। কিন্তু বিশেষ এক পর্যায়ে—ফ্রান্সে, মহান বিপ্লবের পরে—বুর্জোয়শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতাও জয় করে নিল, আর এবার তারাই প্রলেতারিয়েত ও ক্ষুদ্র কৃষকদের উপর শাসকশ্রেণী হয়ে বসলো"। (এঙ্গেলস ঃ "কার্ল মার্কস" প্রবন্ধ)।

সমাজের বিবর্তনের ধারায় দেখা যায় যে, বাণিজ্য ও মুদ্রা প্রচলনের বিকাশ এবং পৃথিবীব্যাপী বাজার গড়ে ওঠার সংগে সংগেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মাঝে এক নতুন শ্রেণী দেখা দিল। এরাই হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী—বুর্জোয়া শ্রেণী। পণ্যদ্রব্য, পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান ও টাকার জোরের থেকেই এলো পুঁজির জোর। পুঁজি দেখা দিল মধ্যযুগের শেষে যখন আমেরিকা আবিষ্কারের পর বিশ্ব বাণিজ্য প্রচুর বেড়ে গেল, যখন মূল্যবান ধাতুর পরিমাণ বেড়ে গেল, যখন সোনা, রুপা আদান-প্রদানের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো, যখন মুদ্রা প্রচলনের ফলে এক একজন লোকের হাতে অজস্র সম্পদ থাকা সম্ভব হয়ে উঠলো। সারা দুনিয়াতেই সোনা ও রুপাকে সম্পদ বলে মানা হতো। ধীরে ধীরে জমিদার শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা কমে গেলো আর নতুন শ্রেণীর —বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা বাড়তে লাগলো। অষ্টাদশ শতক থেকে বরঞ্চ বলা উচিত অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে ও উনিশ শতকে দেশে দেশে বিপ্লব দেখা দিল। পশ্চিম ইওরোপের সব দেশে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটল। সামন্ততন্ত্রের জায়গায় এলো পুঁজিবাদ—পুঁজির মালিকরা অর্থাৎ বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের ইতিহাসকে সাধারণতঃ দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের শাসনাধীনে বুর্জোয়ারা নিজেদের অর্থনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং শ্রেণী হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে ও শ্রেণী হিসাবে

নিজেদের সংগঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। সামন্ত প্রভুদের আমলে বুর্জোয়ারাও ছিল নিষ্পেষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হলো যখন বুর্জোয়ারা উপলব্ধি করলো যে রাজনৈক ক্ষমতা দখল করতে না পারলে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিস্তৃতি আর সম্ভব নয়। তাই শুরু হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই। এই লড়াইয়ের সময় থেকেই তাদের বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু। এই দ্বিতীয় পর্যায়েই দেখা গেল যে বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই নিজেদের শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করেছে এবং এই পর্যায়েই তারা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করলো এবং পুরনো সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার জায়গায় স্থাপন করলো বুর্জোয়া সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা। এ কাজ বুর্জোয়া শ্রেণীকে সম্পন্ন করতে হয়েছে বিপ্লবের মাধ্যমে। এ বিপ্লবই ইতিহাসে বুর্জোয়া বিপ্লব নামে খ্যাত। ইওরোপের ইতিহাসে এ বিপ্লবের প্রথম সূচনা আমরা দেখতে পাই ইংলন্ডের সতেরো শতকের বিপ্লবে এবং পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকের মহান ফরাসী বিপ্লবে দেখতে পাই এ বিপ্লবের পরিণতি। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অভিজাত সামন্তবর্গের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে আসে। সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণু উৎপাদন প্রথার পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক প্রথা প্রবর্তিত হবার ফলে ইওরোপে বুর্জোয়া যুগের প্রতিষ্ঠা হলো।

কিন্তু বুর্জোয়াদের এই বিকাশের মূলসূত্রটি কি ? "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর" ভাষায় এই মূল সূত্রটি হলো এইরূপ ঃ "উৎপাদন ও বিনিময়ের যে সব উপায়কে ভিত্তি করে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের গড়ে তুলেছে, তাদের উৎপত্তি সামন্ত সমাজের মধ্যে। উৎপাদন ও বিনিময়ের এই সব উপায়ের বিকাশের একটা পর্যায় এলো যখন সামন্ত সমাজের উৎপাদন ও বিনিময়ের শর্ত, সামন্ত কৃষি ও হস্তশিল্প কারখানার সংগঠন, এক কথায় মালিকানার সামন্ত সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই বিকশিত উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে খাপ খেল না। এগুলি তখন শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে শৃঙ্খল ভাঙতে হতো এবং তা ভেঙে ফেলা হলো। তাদের জায়গা এগিয়ে এলো অবাধ প্রতিযোগিতা, সেই সঙ্গে তারই উপযোগী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।"

বিকাশের এই ধারায় এক সময়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। সামন্ত সমাজের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। যেখানেই তারা "প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক তারা শেষ করে দিয়েছে" (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো)। নিজেদের

বাঁচার জন্যই তারা উৎপাদনের উপকরণে বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছে ; নিজেদের মুনাফার অংক বাড়াবার তাগিদে এবং অবাধ প্রতিযোগিতার তাড়নায় তারা শক্তিশালী উৎপাদিকাশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়েছে। ফলে উৎপাদন সম্পর্কেও বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু উৎপাদিকা শক্তির বিপুল বিকাশের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী তার নিজের ধ্বংসের ভিত্তিও সৃষ্টি করলো। "যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে এবং উৎপন্ন দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে" (ম্যানিফেস্টো)। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বেশি বেশি পুঁজি, বেশি বেশি মুনাফা লাভের আশায় বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু এই বিকাশের ধারায় এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয় যখন উৎপাদনে বুর্জোয়া মালিকানা স্বত্ব উৎপাদন শক্তির বিকাশের পথে প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই প্রতিফলিত হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা। তাই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে ঃ

"নিজের উৎপাদন সম্পর্ক, বিনিময় সম্পর্ক ও সম্পত্তি সম্পর্কসহ আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ—ভেলকিবাজির মতো উৎপাদনের ও বিনিময়ের এমন বিশাল উপায় গড়ে তুলেছে যে সমাজ, তার অবস্থা আজ সেই যাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তি সমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। গত বহু দশক ধরে শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস হলো শুধু বর্তমান উৎপাদন-সম্পর্কের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণী ও আধিপত্যের যা মূলশর্ত সেই মালিকানা সম্পর্কের বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন-শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবার আরো বেশি করে গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে ফেলে, তার উল্লেখই যথেষ্ট। এই সব সংকটে শুধু যে উপস্থিত উৎপন্নের অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, আগেকার সৃষ্ট উৎপাদন শক্তির অনেকটাও এতে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস পায়। এই সব সংকটের ফলে এমনই মহামারী হাজির হয় অতীতে সকল যুগে যা অসম্ভব গণ্য করা হত—অতি উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়, মনে হয় যেন বা এক দুর্ভিক্ষে, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধ হয়ে গেলো জীবনধারণের সমস্ত উপায়—সরবরাহের পথ, শিল্প-বাণিজ্য যেন নষ্ট হয়ে গেল ; কি কারণে ? কারণ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে, জীবনধারণ সামগ্রীতে দেখা দিয়েছে অতিপ্রাচুর্য, অনেক বেশি হয়েছে শিল্প, অনেক বেশি বাণিজ্য। সমাজের হাতে যত উৎপাদন-শক্তি আছে, বুর্জোয়া মালিকানার শর্ত বিকাশে তা আর সাহায্য করছে না ; বরং এই যে শর্তে সে শক্তি শৃংখলিত ছিল তার তুলনায় এ শক্তি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি প্রবল ;

শৃংখলের বাধা তা কাটিয়ে ওঠা মাত্র সমস্ত বুর্জোয়া সমাজে এনে ফেলে বিশৃংখলতা, বিপন্ন করে বুর্জোয়া মালিকানার অস্তিত্ব। বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পদ উৎপন্ন করে তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা বড়ই সংকীর্ণ। এ সংকট থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী আবার কোন্ উপায়ে নিস্তার পায় ? এক দিকে, উৎপাদন শক্তির বিপুল অংশ বাধ্য হয়ে নষ্ট করে ফেলে, অপর দিকে নতুন বাজার দখল করে এবং পুরানো বাজারের পূর্ণতর শোষণে। অর্থাৎ বলা যায় আরও ব্যাপক, আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকেই কমিয়ে এনে।

যে অস্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করেছিল সেই অস্ত্র আজ তাদেরই বিরুদ্ধে উদ্যত।

যে অস্ত্রে তাদের মৃত্যু বুর্জোয়া শ্রেণী শুধু সে অস্ত্রটুকুই গড়ে নি ; এমন লোকও তারা সৃষ্টি করেছে যারা সে অস্ত্র ধারণ করবে, সৃষ্টি করেছে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীকে, প্রলেতারিয়েতকে।"

তাই বলা হয়ে থাকে যে, বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করছে সর্বোপরি তারই সমাধিখনকদের—প্রলেতারিয়েতের।

১১

প্রলেতারিয়েত বলতে কি বুঝায় ?

প্রলেতারিয়েত বলতে কি বুঝায় ? সাধারণ কথায় প্রলেতারিয়েত হচ্ছে বর্তমানকালের শ্রমিক শ্রেণী যারা কাজ করে কলে কারখানায়, খনিতে। কিন্তু কলকারখানা, খনির মালিক তারা নয়। তারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক নয়। সমাজে উৎপাদনের উপায়ের সংগে জনসংখ্যার যে-অংশের যে রকম সম্পর্ক তা দিয়ে নির্ধারিত হয় তার শ্রেণী। যেমন বর্তমান সমাজে কল কারখানা, খনি—এক কথায় উৎপাদনের উপায়সমূহ যাদের হাতে তারা হচেছ ধনিকশ্রেণী অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণী। অন্যদিকে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর যাদের কোন স্বত্ব নেই অথচ জীবনধারণের জন্য তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে হয় তারা হচেছ শ্রমিক শ্রেণী অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত।

মার্কস ও এংগেলস "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে" প্রলেতারিয়েত কথাটি বারবার ব্যবহার করেছেন এবং প্রলেতারিয়েতকে একটি শ্রেণী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে এই শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবই ধন-

তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ করবে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। তাঁরা আরও দেখিয়েছেন যে ধনতন্ত্রী সমাজে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীই একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবী। "সকল দেশের প্রলেতারিয়েত ঐক্যবদ্ধ হও" এই রণধ্বনি দিয়ে তাঁরা 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' শেষ করেছেন।

ধনতন্ত্রী সমাজে প্রলেতারিয়েত বলতে তাদেরই বোঝায় যাদের জীবিকা নির্বাহ করবার জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে হয়। এ সমাজে প্রলেতারিয়েতরা বিত্তহীন; উৎপাদনের উপায় ও উপকরণ থেকে তারা বঞ্চিত; নিজেদের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কোন সম্পত্তি তাদের নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয়ে থাকে ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগ। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রলেতারিয়েত কথাটির প্রচলন দেখা যায় ইওরোপে। এঙ্গেলস তাঁর "ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা" গ্রন্থের মূল জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি এই গ্রন্থে "শ্রমিক প্রলেতারিয়েত, শ্রমিক শ্রেণী, বিত্তহীন শ্রেণী" কথাগুলো একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। ধনতন্ত্রী সমাজে প্রলেতারিয়েতের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে এঙ্গেলস তাঁর "কমিউনিজমের মূলনীতি" গ্রন্থে লিখেছেন:

"প্রলেতারিয়েত হচ্ছে সমাজের সেই শ্রেণী যাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করার উপর—পুঁজি থেকে উদ্ভূত মুনাফার উপর এটা নির্ভর করে না; এদের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য, জীবন-মরণ, এদের সমগ্র অস্তিত্বই নির্ভর করে শ্রমশক্তির চাহিদার উপর, বাজারের ভালো অবস্থা, খারাপ অবস্থার উপর, বল্গাহীন প্রতিযোগিতার ফলে সৃষ্ট ওঠা-নামার উপর—এক কথায় প্রলেতারিয়েত বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রমিক শ্রেণী।"

শিল্প বিপ্লবের ফলেই এই প্রলেতারিয়েতের আবির্ভাব। বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে ধনতন্ত্র গড়তে গিয়েই সৃষ্টি করেছে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীকে, প্রলেতারিয়েতকে। তারা যেমন যন্ত্র সৃষ্টি করেছে তেমন সৃষ্টি করেছে যন্ত্র চালকদের, প্রলেতারিয়েতদের। লক্ষ্য করবার বিষয় যে ধনতন্ত্রের বিকাশের ধারায় "যে পরিমাণে বুর্জোয়াশ্রেণী অর্থাৎ পুঁজি বেড়ে চলে ঠিক সেই অনুপাতে বিকাশলাভ করে প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী। মেহনতীদের এ শ্রেণীটি বাঁচতে পারে যতক্ষণ কাজ জোটে, আর কাজ জোটে শুধু ততক্ষণ, যতক্ষণ তাদের পরিশ্রমে পুঁজি বাড়তে থাকে। এই মেহনতীদের নিজেদের টুকরো টুকরো করে বেচতে হয়। বাণিজ্যের অন্যান্য সামগ্রীর মতনই তারা পণ্যদ্রব্যের শামিল। আর সেই হেতু নিয়তই প্রতিযোগিতার সবকিছু ঝড় ঝাপটা, বাজারের সবরকম ওঠানামার অধীন তারা।" (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো)।

বুর্জোয়া শ্রেণীর তত্ত্বিশারদরা বলে থাকেন যে, ধনতন্ত্রী সমাজেই মানুষের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে, এ সমাজে শোষণের নাগপাশে কোন মানুষকে বেঁধে রাখা হয় না, যেমনটি হতো ক্রীতদাস প্রথায় এবং ভূমিদাস প্রথায়। তাঁরা বলে থাকেন যে, ধনতন্ত্রী সমাজে সব মানুষেরই সমান অধিকার, আইনের চোখে সবাই এক। কিন্তু ধনতন্ত্রী সমাজের মূল কথা হলো শোষণ—মেহনতী মানুষকে শোষণ করেই বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি এবং এই শোষণ ব্যবস্থাকে আড়াল করে রাখার উদ্দেশ্যেই বুর্জোয়ারা "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা"র জয়গান করে। বুর্জোয়ারা বলে: দাস ব্যবস্থায় দাস মালিকেরা যেমন দাসদের, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূস্বামীরা যেমন ভূমিদাসদের শোষণ করতো, নির্যাতন করতো, তাদের শ্রমলব্ধ ফল আত্মসাৎ করতো, আমরা তা করি না, আমরা শ্রমিকদের দিয়ে কল কারখানায়, খনিতে কাজ করাই এবং এ কাজের জন্য তাদের প্রাপ্য মজুরি দিই।

বুর্জোয়াদের এই কথার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক আছে। ধনতন্ত্রী সমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পুঁজিপতিদের কাছে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে হয়। তাই মার্কস ও এংগেলস এই শ্রমশক্তিকে বলেছেন পণ্যদ্রব্যের শামিল। কিন্তু এই পণ্যের একটা অদ্ভুত গুণ আছে, যে গুণ অন্য কোনো পণ্যের নেই—এই পণ্য নতুন মূল্য সৃষ্টি করে থাকে। এই অদ্ভুত গুণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এংগেলস বলেছেন:

"সমাজের বর্তমান অবস্থায় পণ্যদ্রব্যের বাজারে পুঁজিপতি পায় এমন এক পণ্য যার এক অদ্ভুত গুণ আছে: এই পণ্যের ব্যবহারই হলো নতুন মূল্যের উৎস, এতে নতুন মূল্যের সৃষ্টি হয়। এই পণ্যের নাম শ্রমশক্তি।"

"শ্রমশক্তির মূল্য কি? প্রতিটি পণ্য উৎপাদনে যতখানি শ্রম প্রয়োজন হয় তা দিয়ে মাপা হয় সেই পণ্যের মূল্য। শ্রমশক্তির অস্তিত্ব হলো জীবন্ত শ্রমিকের মধ্যে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্য—এই পরিবারই তার মৃত্যুর পরে শ্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে—তার নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাণধারণের উপকরণ প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রাণধারণের এই উপকরণ উৎপাদনের যতখানি শ্রমকাল লাগে তাই হলো শ্রমশক্তির মূল্য। পুঁজিপতি প্রতি সপ্তাহে এই মূল্যেটুকু দিয়ে শ্রমিকের এক সপ্তাহের শ্রম ব্যবহার করার অধিকার কিনে নেয়।...

"এরপর পুঁজিপতি তার শ্রমিককে কাজে লাগায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাপ্তাহিক মজুরির সমান পরিমাণ শ্রম শ্রমিক করে ফেলবে। ধরা যাক যে, একজন শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজুরির পরিমাণ হয় তিন শ্রম দিনের সমান। তা হলে সোমবার থেকে শুরু করে বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে সে প্রাপ্ত মজুরির পূর্ণ

মূল্য পুঁজিপতিকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু তখন কি সে কাজ বন্ধ করে দেয়? মোটেই না। পুঁজিপতি তার সপ্তাহেরই শ্রম কিনেছে তাই সপ্তাহের শেষ তিনটি দিনও তাকে কাজ করে যেতে হবে। শ্রমিকের মজুরি প্রত্যর্পণের জন্য যে সময় প্রয়োজন হয় তার উপর বাড়তি এই যে উদ্বৃত্ত শ্রম এটাই হলো উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস, মুনাফার, পুঁজির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির উৎস।

"একথা বলবেন না যে, শ্রমিক প্রাপ্ত মজুরির সমপরিমাণ কাজ তিন দিনে করে দিয়ে বাকি তিন দিন পুঁজিপতির জন্য খাটে—এটা হলো খেয়ালখুশি মতো ধরে নেওয়ার ব্যাপার, মজুরি ফিরিয়ে দেবার জন্য শ্রমিকের ঠিক তিনদিন না দুদিন, না চারদিন লাগে সে কথা নিশ্চয়ই এখানে অবান্তর, অবস্থা অনুযায়ী তার তারতম্য ঘটবে। আসল কথা হলো এই যে, পুঁজিপতি যতখানি শ্রমের জন্য পয়সা দিয়েছে তা ছাড়াও এমন কিছুটা শ্রম আদায় করে নেয় যার জন্য সে পয়সা দেয়নি, আর এ কথাটা আদৌ খেয়ালখুশি মতো ধরে নেওয়া ব্যাপার নয়। কারণ শেষ পর্যন্ত যেদিন পুঁজিপতি যতটা মজুরি দিয়েছে ঠিক তার সমান শ্রমই শ্রমিকের কাছ থেকে আদায় করবে সেই দিনই সে তার কারখানা বন্ধ করে দেবে। কারণ আসলে তখন তার সমস্ত মুনাফা দাঁড়াবে শূন্যে।

"শ্রমশক্তির মূল্য দেওয়া হয় কিন্তু পুঁজিপতি এই শ্রমশক্তি থেকে যতখানি মূল্য আদায় করে নেয় তার তুলনায় কম সে মূল্য, এবং ঠিক এই পার্থক্যটুকু, এই অবৈতনিক শ্রমটুকুই হলো পুঁজিপতির অংশ, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে গোটা পুঁজিপতি শ্রেণীর অংশ।"

অর্থাৎ পুঁজিপতি যে সব শ্রমিককে নিয়োগ করে তাদের প্রত্যেককে দুই ধরনের শ্রম করতে হয়ঃ শ্রমকালের একটা অংশে সে পুঁজিপতিদের আগাম দেওয়া মজুরি প্রত্যর্পণ করে, আর তার শ্রমের এই অংশের নাম মার্কস দিয়েছেন আবশ্যিক শ্রম। কিন্তু তারপরেও তাকে কাজ করে যেতে হয় আর সেই সময়টায় সে উৎপাদন করে পুঁজিপতিদের জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য। এরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মুনাফা। শ্রমের এই অংশটার নাম উদ্বৃত শ্রম।" (এঙ্গেলস ঃ মার্কসের পুঁজি)

এই উদ্বৃত্ত শ্রম, উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে পুঁজিপতিদের শোষণের রূপটা—শ্রমিককে মজুরি দেওয়া হয় বলেই এই শোষণের রূপটাকে আড়াল করে রাখা হয়। মজুরি প্রথার এই হলো বৈশিষ্ট্য। মজুরি প্রথার এমনি মাহাত্ম্য যে, যে শ্রমের জন্য শ্রমিককে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না সেটাকেও দেখানো হয় পারিশ্রমিক দেওয়া শ্রম হিসাবে। দাসপ্রথায় দাস মালিকরা ক্রীতদাস-দের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করতো এবং তাদের দিয়ে শ্রম করাতো। তাদের ক্ষেত্রে মনে হতো যে তারা সমস্ত শ্রমের বদলে কিছুই পেল না। ফিউডাল

ব্যবস্থায় কিন্তু পারিশ্রমিক দেওয়া শ্রম আর পারিশ্রমিক না দেওয়া শ্রম বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কৃষক ভূমিদাস তার নিজের বা বরাদ্দ জমিটুকুতে নিজের জন্য তিনদিন কাজ করতো, আর পরের তিনদিন তাকে তার প্রভুর জমিতে বাধ্যতামূলক ভাবে ও বিনা মজুরিতে বেগার খাটতে হতো।

মার্কসের কথায়ঃ "একজন মানুষের সপ্তাহে তিনদিন নিজের জমিতে ও তিনদিন বিনা পারিশ্রমিকে প্রভুর জমিতে কাজ করা, আর ফ্যাক্টরি বা কারখানায় রোজ ছ'ঘণ্টা নিজের জন্য ও ছ'ঘণ্টা মালিকের জন্য খাটা—আসলে এ দুটো কিন্তু একই ব্যাপার। যদিও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমের পারিশ্রমিক পাওয়া ও পারিশ্রমিক না পাওয়া অংশ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশানো থাকে আর গোটা লেনদেনের চরিত্রটি সম্পূর্ণ গোপন থাকে একটি চুক্তির মধ্যস্থতায় এবং সাপ্তাহিক বেতনের আড়ালে। পারিশ্রমিক না পাওয়া শ্রম এক-ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক এবং অপরক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বলে বোধ হয়। এইটুকুই যা তফাত"। (মার্কস ঃ মজুরি দাম মুনাফা)

আসলে মজুরি প্রথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এক নতুন ধরনের দাসত্ব এবং এই দাসত্বের বলি হচ্ছে যারা তারাই হলো প্রলেতারিয়েত। দাস প্রথায় প্রকাশ্যেই ক্রীতদাসদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো, আর মজুরি প্রথায় প্রলেতারিয়েতকে বেঁধে রাখা হয় এক অদৃশ্য শিকল দিয়ে; সে শিকল হচ্ছে মজুরির শিকল। তাই ধনতন্ত্রী সমাজের অন্য নাম হচ্ছে মজুরিদাসত্ব ব্যবস্থা।

পুরানো কালের অন্যান্য দাসত্ব ব্যবস্থার মতন মজুরি দাসত্ব ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়। প্রলেতারিয়েতই এই ব্যবস্থার অবসান করবে; ইতিহাসের গতিধারায় এটা অবশ্যম্ভাবী—এই কথাই ঘোষণা করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। তাঁদের রচিত "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে বলা হয়েছেঃ

"বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের মূল শর্ত হলো পুঁজির সৃষ্টি ও বৃদ্ধি; পুঁজির শর্ত হলো মজুরি শ্রম। মজুরি শ্রম সম্পূর্ণভাবে মজুরদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যন্ত্রশিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে তার ফলে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা-হেতু বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন-হেতু বিপ্লবী ঐক্য। সুতরাং যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে ও উৎপন্ন দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্জোয়াশ্রেণী সৃষ্টি করছে সর্বোপরি তারই সমাধিখনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ দুইই অনিবার্য।"

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই ঘোষণার ফল আমরা দেখছি বিংশ শতাব্দীতে দুনিয়ার এক চতুর্থাংশ জনপদে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়।

১২

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের মৌলিক রূপ

ধনতন্ত্রী সমাজে যে শ্রেণী সংগ্রাম চলে তা হচ্ছে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম—অন্য কথায় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম। ধনতন্ত্রী সমাজে শ্রেণী বিরোধটা বেশ সরল এবং বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—"গোটা সমাজ ক্রমেই দু'টি বিশাল শত্রুশিবিরে ভাগ হয়ে পড়ছে। ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন দুই বিরাট শ্রেণীতে—বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতে।" (মার্কস ও এঙ্গেলস ঃ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো)।

বর্তমান পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এই সংগ্রাম অভিব্যক্ত হচ্ছে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে। প্রলেতারিয়েতের এই শ্রেণী সংগ্রাম বিকশিত হয়ে ওঠে বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়ে—অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। প্রলেতারিয়েতের এই সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সংগ্রামের এই তিনটি রূপই হলো প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের মৌল রূপ।

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের, এই তিনটি রূপের (অর্থনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও মতাদর্শগত সংগ্রাম) চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে জানা দরকার এবং তার সঙ্গে জানা দরকার এই তিনটি রূপের মধ্যে যোগসূত্রটা কোথায়?

(ক) অর্থনৈতিক সংগ্রাম

প্রলেতারিয়েতের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম আমরা প্রতিনিয়তই কলে-কারখানায় দেখছি। এই অর্থনৈতিক সংগ্রাম কলকারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের বিকাশের প্রথম স্তরে এমন একটা অবস্থা ছিল যখন শ্রমিকেরা তাদের মূল শত্রুকে চিনতে পারেনি। বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে শ্রমিকদের দুঃখ কষ্টের মূল কারণ, সে কথা শ্রমিকেরা তখনো উপলব্ধি করতে পারেনি, তারা ভাবতো মেসিনই তাদের দুঃখ-কষ্টের, দারিদ্র্যের উৎস। তাই তখন তারা তাদের আক্রমণ বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, মেসিন মালিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত না করে পরিচালিত করেছিল মেসিনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ উৎপাদনের আধুনিক যন্ত্রের বিরুদ্ধে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকেরা মেসিন

ভাঙার আন্দোলন শুরু করে। ইতিহাসে এই আন্দোলন 'লাডাইট আন্দোলন' নামে খ্যাত। কথিত আছে যে, নেডলাড নামক একজন তাঁতি প্রথমে একটা মেসিন ভেঙে ফেলেন। তারপর থেকে অন্যান্য শ্রমিকেরা মেসিন ভাঙতে আরম্ভ করেন। তাদের মুখে তখন এই কথা শোনা যেত যে, "লাড যা করেছে আমি তাই করতে যাচ্ছি।" এই 'লাডাইট' আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮১২ সালে মেসিন ভাঙার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আইন পাস করে এবং কারখানায় কারখানায় সৈন্য মোতায়েন করে। এর কিছুকাল পরে সাইলেসিয়ান তাঁতিদের মধ্যে মেসিন ভাঙার অনুরূপ আন্দোলন দেখা দেয়। রুশ দেশেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পযন্ত্রাদি ধ্বংসের অভিযান চলেছিল। শ্রমিকদের এই যে সংগ্রাম এর মূলে ছিল সমাজ বিকাশের ধারা সম্পর্কে শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা। মেসিন ও পুঁজিপতিদের মালিকানায় মেসিনের ব্যবহারের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা বুঝতে শ্রমিকদের সময় ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল।

মেসিন ভাঙার এই সংগ্রাম ছিল শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ততারই অভিব্যক্তি। শ্রমিকদের সংগ্রামের বিকাশধারায় এই মেসিন ভাঙার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের চেতনার একটা জাগরণই প্রকাশ পেলো। লেনিনের কথায়ঃ "সেটা হলোঃ যে ব্যবস্থা তাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, তার চিরন্তনতা সম্পর্কে যুগ-যুগান্তব্যাপী বিশ্বাস তারা করছে। তারা বুঝতে শুরু করল বলব না, কিন্তু অনুভব করলো যৌথ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা। এবং তাদের উপরওয়ালাদের পায়ে দাসসুলভ আত্মসমর্পণ করা সুনির্দিষ্টভাবেই বন্ধ করলো। কিন্তু এ সমস্ত কিছুতেই সংগ্রামের চেয়ে বেশি ছিল মরিয়া হয়ে ওঠার প্রবৃত্তি আর প্রতিশোধ স্পৃহার বিস্ফোরণ"। (লেনিনঃ "কি করিতে হইবে")

প্রলেতারিয়েতের বিকাশের এই স্তরের পর থেকেই চলেছে তার শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের বিভিন্ন রূপ।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, সব দেশেই শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যায় কলে-কারখানায় ঢোকানো হয় এবং উৎপাদনের জন্যই তাদের সৈনিকদের মতন সংগঠিত করা হয় কারখানার নিয়মকানুন দিয়ে। এই সব শ্রমিকই কিছুদিন বাদে মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়। তারা সংগ্রাম করতে বাধ্য হয় নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহের অবস্থার এবং কলে-কারখানায় নিজেদের শ্রম করার অবস্থার উন্নতির জন্য। এই সংগ্রামই হচ্ছে অর্থনৈতিক সংগ্রাম। এই সংগ্রাম শ্রমিকেরা পরিচালনা করে নিজেদের মজুরির হার বাড়াবার, কাজের ঘন্টা কমাবার, ছুটির নিয়ম প্রবর্তনের দাবি এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতির অন্যান্য দাবি নিয়ে। নিজেদের দাবিদাওয়া মালিকশ্রেণীর

কাছে পেশ করা এবং সেই সব দাবি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন করা যেমন, গণডেপুটেশন, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি এবং সেই সব দাবি যদি পূরণ না করা হয় তাহলে ধর্মঘট চালানো—এই হচ্ছে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি।

প্রত্যেকটি শ্রমিকই—তারা রাজনৈতিকভাবে যে যতই অনুন্নত হোক না কেন—তার আশু অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাটা ভালোভাবেই বোঝে। সে জানে যে তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে এবং তার জন্যই তাকে নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা করতে হবে। এর জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হবে মালিকের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে। একা সংগ্রাম করা কোনো শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সংগ্রামের জন্য শ্রমিকেরা মিলিত সমিতি অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে। এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে তারা দাবিদাওয়া আদায়ের সংগ্রাম চালায়। শ্রমিকদের এই সংগ্রাম হচ্ছে অর্থনৈতিক সংগ্রাম। পুঁজিবাদ যতদিন টিকে থাকবে ততদিন শ্রমিকশ্রেণীকে এই অর্থনৈতিক সংগ্রাম করতে হবে।

এই অর্থনৈতিক সংগ্রাম হচ্ছে মালিকের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম। এ সংগ্রাম যে শ্রেণী সংগ্রামেরই একটা রূপ সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক সংগ্রাম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার।

প্রথমত, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও অর্থনৈতিক সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। বহু দেশের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সুবিধা আদায় করে থাকে—যেমন, আট ঘন্টা কাজ, মজুরির গ্রেড, সোস্যাল ইনস্যুরেন্স, ছুটি ইত্যাদি। কমিউনিস্টরা শ্রমিক শ্রেণীর ও মেহনতী জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য লড়াই করে থাকে। তাই তারা শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য যথেষ্ট নজর দিয়ে থাকে ; অর্থনৈতিক সংগ্রামকে তারা বাতিল করে দেয় না। তারা এ কথা সব সময়েই মনে রাখে যে, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলা আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের সংগ্রাম এমন একটি সংগ্রাম যার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপকতম অংশ এসে শামিল হয়। অর্থনৈতিক সংগ্রাম এই ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপকতম অংশকে আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসে। ফলে এই অর্থনৈতিক সংগ্রামই শ্রমিকদের পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের স্কুলের. শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনায় শিক্ষিত করার স্কুলের কাজ করে থাকে। এদিক থেকে

বিচার করলে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের উচ্চতর রূপগুলির সাফল্য অনেকাংশে এই লড়াইয়ের উপর নির্ভর করে থাকে।

কিন্তু একথা সবসময়ে মনে রাখা দরকার যে, এই অর্থনৈতিক সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে। এই অর্থনৈতিক সংগ্রাম হচ্ছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা সুবিধা আদায়ের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তির উপর আঘাত হানে না। তাই এই সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর মূল অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষিত করতে পারে না; এই অর্থনৈতিক সংগ্রাম শ্রমিকদের শোষণের অক্টোপাস থেকে মুক্ত করতে পারে না; অর্থনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে যতো বেশি সুযোগ সুবিধা আদায় করা যাক না কেন, এই সংগ্রামের ফলে ধনতান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটে না, ধনতান্ত্রিক শোষণ থেকেই যায়। কিন্তু এই অর্থনৈতিক সংগ্রামের একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন যে, এইসব "সংগ্রামের আসল লাভ আশু ফলাফলে নয়, আসল লাভ হলো মজুরদের ক্রমবর্ধমান একতায়।"

তাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই অভিমতই পোষণ করে যে, যেখানে শ্রমিকদের সংগ্রাম তাদের আশু অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের চৌহদ্দির মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ থাকে সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলন কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করতে পারে না। প্রলেতারিয়েতের, শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত শ্রেণীসংগ্রাম তখনই শুরু হয় যখন শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম শ্রমিকদের আশু স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে এগিয়ে যায় এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে বিকশিত হয়ে ওঠে।

লেনিনের কথায়ঃ

"প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রাম অর্থনৈতিক সংগ্রাম (শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য এক একজন পুঁজিপতি বা এক একটা পুঁজিপতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম) এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে (জনগণের অধিকার বিস্তারের জন্য অর্থাৎ গণতন্ত্র এবং প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম) বিভক্ত। কিছু কিছু রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাট মনে করেন অর্থনৈতিক সংগ্রাম অতুলনীয় রকমের গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক সংগ্রামটা প্রায় একটা মোটামুটি দূর ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা হয়। এরকম অভিমত একেবারেই ভুল। সমস্ত সোস্যাল ডেমোক্রাটই একথা মানেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলা আবশ্যক; সেই ভিত্তিতে শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন চালানো অর্থাৎ মালিকদের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামে মজুরদের সাহায্য করা, অত্যাচারের সমস্ত ধরন ও উপলক্ষের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং এই উপায়ে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো আবশ্যক।

কিন্তু অর্থনৈতিক সংগ্রামের কারণে রাজনৈতিক সংগ্রাম ভুলে যাওয়ার অর্থ বিশ্ব সোস্যাল ডেমোক্রাসির মূল কথাটা থেকেই বিচ্যুতি, তার অর্থনৈতিক আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাস যে শিক্ষা দেয় সেইটেই ভুলে যাওয়া।...কোনো অর্থনৈতিক সংগ্রামেই শ্রমিকদের কায়েমী উন্নতি সম্ভব নয় এমন কি ব্যাপক আকারে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম চালানোই সম্ভব হয় না যদি অবাধে সভা ও ইউনিয়ন গঠনের অধিকার তাদের না থাকে, নিজেদের পত্রিকা না থাকে, লোকসভায় নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাতে তারা যদি না পারে......। আর এ সব অধিকার অর্জন করতে হলে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো দরকার।...সমস্ত অর্থনৈতিক সংগ্রাম অনিবার্যরূপেই পরিণত হয় রাজনৈতিক সংগ্রামে আর সোস্যাল ডেমোক্রাসির উচিত উভয় সংগ্রামকেই প্রলেতারিয়েতের অখণ্ড শ্রেণী সংগ্রামে অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত করা।" (লেনিন ঃ কালেকটেড ওয়ার্কস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১২-২১৩)

লেনিনের এই বক্তব্য প্রত্যেকটি কমিউনিস্টকে সব সময়ে স্মরণ রাখা দরকার এবং তাদের নিজ নিজ এলাকায় শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে লেনিনের ঐ নির্দেশ অনুসরণ করা কর্তব্য।

(খ) রাজনৈতিক সংগ্রাম

শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ হলো রাজনৈতিক সংগ্রাম। নিজেদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায় করার সংগ্রামের ধারার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করে যে, তাকে রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে হবে। নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য শ্রমিকদের অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম করতে হয়। এই অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাতে গিয়ে শ্রমিকেরা দেখে যে মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্র এগিয়ে আসে। শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিলকে ছত্রভংগ করে দেবার জন্য, তাদের ধর্মঘট ভাঙার জন্য পুঁজিপতিরা অভিযান চালায়। আর এই অভি-যানকে সাহায্য করার জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্র এগিয়ে আসে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার। বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের উপর আঘাত হানতে যারা নিজেদের জীবনযাপনের তাগিদে বাধ্য হয় সেই মেহনতী জনগণকে শ্রমিক-কৃষককে দাবিয়ে রাখার দমন-পীড়নের যন্ত্র হচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্র। শ্রমিকরা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায় এই সত্যই প্রত্যক্ষ করে যে, তাদের ধর্মঘট ভাঙার জন্য আসে পুলিস। জীবনের অভিজ্ঞতায় তারা উপলব্ধি করে যে, তাদের শুধু কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেই চলবে না, তাদের সংগ্রাম করতে হবে মালিকদের স্বার্থ যারা রক্ষা করে থাকে সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামই হচেছ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম।

নিজেদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য শ্রমিকরা সংঘবন্ধ হয়। অর্থনৈতিক আন্দোলন করতে গিয়ে শ্রমিকরা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। বুর্জোয়ারা আর তাদের দালালেরা কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের কাজকে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে সীমাবন্ধ রাখতে চায়, ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে কোনরকম রাজনীতি, আসলে শ্রমিকদের রাজনীতিতে না নিয়ে আসার উপদেশই তারা দিয়ে থাকে। কিন্তু এতো বাস্তব ঘটনা যে, শ্রমিকদের বাস্তব জীবনই তাদের রাজনীতির মধ্যে নিয়ে আসে। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন আর রাজনৈতিক কার্যকলাপ অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অর্থনৈতিক সংগ্রামের সংগে রাজনৈতিক সংগ্রামের সম্পর্ক কি ও শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ শ্রেণীসংগ্রামে অর্থনৈতিক সংগ্রামের ভূমিকা কি, তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে মার্কস ১৮৭১ সালে "বলতের"-র কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

"...শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম লক্ষ্য, অবশ্য, শ্রমিকশ্রেণীর জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় এবং তার জন্য স্বভাবতই প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর এমন একটি প্রাথমিক সংগঠন যা তার অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়ে কিছুটা পর্যন্ত বিকশিত হয়ে উঠেছে।

"অন্যদিকে অবশ্য যে আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণী শাসক শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে শ্রেণী হিসাবে এগিয়ে আসে এবং 'বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টি' দ্বারা তাদের বাধ্য করার চেষ্টা করে এমন প্রত্যেকটি আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলন। যেমন, কোনো একটি বিশেষ কারখানায়, এমন কি কোন একটি বিশেষ শিল্পে ধর্মঘট ইত্যাদির দ্বারা ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের কাজের ঘণ্টা কমাতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু দিনে আট ঘণ্টা কাজ ইত্যাদির আইন প্রণয়নে বাধ্য করার আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন। এইভাবে, শ্রমিকদের পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্য থেকে সর্বত্র গড়ে ওঠে রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থাৎ শ্রেণীর আন্দোলন যার উদ্দেশ্য হলো সাধারণরূপে অর্থাৎ সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে বাধ্যতামূলক আকারে সেই শ্রেণীর স্বার্থসাধন। এই আন্দোলনগুলির জন্য যদি আগে থেকেই কিছুটা পরিমাণ সংগঠন থাকার প্রয়োজন থাকে, তাহলে এই আন্দোলনগুলিও আবার একইভাবে এই সংগঠনকে বিকশিত করে তোলার উপায়ও বটে।

"যৌথ শক্তির অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত অভিযানে নামার মতো যথেষ্ট অগ্রসর সংগঠন যদি শ্রমিকশ্রেণীর না থাকে তাহলে শাসক শ্রেণীগুলির শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে এবং এই শ্রেণীগুলির নীতির প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করে শ্রমিকশ্রেণীকে অন্ততঃ

সেজন্য শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নতুবা শ্রমিকশ্রেণী তাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে…।”

মার্কস এখানে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য তার “অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত প্রাথমিক সংগঠনের” অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত করেছেন এবং কি অবস্থায় একটি আন্দোলন আর একটিতে বিকশিত হয়ে উঠছে তা দেখাচ্ছেন।

প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নের যে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে সেকথা মার্কস শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তুলে ধরলেন। কিন্তু সংগে সংগে মার্কস ট্রেড ইউনিয়নের আংশিক ও সাধারণ ব্যর্থতার দিকটাও দেখালেন। তিনি “মজুরি, দাম, মুনাফা” পুস্তিকার উপসংহারে লিখলেন ঃ

“পুঁজির হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ঘাঁটি হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভাল কাজ করে। তাদের আংশিক ব্যর্থতা এই জন্য যে, স্বীয় ক্ষমতা বিবেচকের মতো ব্যবহার করে না। তাদের সাধারণ ব্যর্থতা এই জন্য যে প্রচলিত ব্যবস্থাকে একই সংগে পাল্টানোর চেষ্টার বদলে, শ্রমিকশ্রেণীর চরম মুক্তির জন্য অর্থাৎ মজুরি প্রথার চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য আপনার সংগঠিত শক্তিটাকে চালকদণ্ড হিসাবে প্রয়োগ করার বদলে এই ব্যবস্থার ফলাফলের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালানোর মধ্যেই তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখে।”

এভাবে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখলে যে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আসবে না এবং শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে বিকশিত করে তোলা যে একান্ত আবশ্যক এবং এর জন্য যে বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়া, বিপ্লবী চেতনায়, সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা প্রয়োজন তা ব্যক্ত করেই মার্কস ঐ “মজুরি, দাম, মুনাফা” পুস্তিকায় লিখলেন ঃ

“সেই সংগে মজুরি প্রথার ভিতরে সাধারণভাবে যে দাসত্ব নিহিত রয়েছে তার কথা বাদ দিলেও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিদিনকার লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফলাফল নিজেদের মধ্যে অতিরঞ্জিত করে দেখা উচিত নয়। তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তারা লড়ছে ফলাফলের সংগে, ঐ ফলাফলের হেতুর সংগে নয়; তারা নিম্নগতি মন্দীভূত করছে, সে গতির দিক পরিবর্তন করছে না; তারা উপশমের ওষুধ লাগাচ্ছে, রোগ সারাচ্ছে না। সুতরাং পুঁজির অবিরাম আক্রমণ ও বাজারের হেরফের থেকে অনবরত এই যে সব গেরিলা যুদ্ধের উদ্ভব হচ্ছে তার মধ্যে নিজেদের একান্তভাবে ডুবিয়ে রাখা তাদের উচিত নয়। তাদের বোঝা উচিত যে, বর্তমান ব্যবস্থা যত দুর্গতিই তাদের উপর চাপাক না কেন, সেই সংগে এই ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক

অবস্থা ও সামাজিক রূপ সৃষ্টি করছে। "দিনের ন্যায্য খাটুনির জন্য দিন মজুরি!"—এই রক্ষণশীল নীতির বদলে তাদের উচিত পতাকায় এই বিপ্লবী মন্ত্র মুদ্রিত করা—"মজুরি প্রথার অবসান চাই!"

শোষণের ফলাফলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েও মার্কস শ্রমিক-শ্রেণীকে এই নির্দেশই দিলেন যে, শোষণের হেতু যেটা সেই মজুরি প্রথার অবসানের জন্য তাদের লড়তে হবে।

এই মজুরি প্রথার অবসানের জন্যই শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হবে এবং সে-সংগ্রাম সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম।

শ্রমিকশ্রেণী, অন্ততঃপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশ যখন শ্রেণী সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং নিজেদের মূল স্বার্থটা, মজুরি প্রথা অবসানের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে কেবলমাত্র তখনই সম্পূর্ণভাবে বিকশিত রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্ভব হয়ে ওঠে।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিধি বেশ বিস্তৃত। সমাজ জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রব্যাপী এই সংগ্রাম পরিব্যাপ্ত। বুর্জোয়া সমাজের অন্যান্য শ্রেণী ও স্তর সম্পর্কে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও তার কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টি-ভঙ্গি এই রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত।

লেনিনের কথায়ঃ "শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা সত্যিকারের রাজনৈতিক চেতনা হয়ে উঠতে পারে না, যদি না শ্রমিকরা স্বৈরাচার, অত্যাচার, হিংসাত্মক আচরণ এবং গালিগালাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই—তা সে যে কোন শ্রেণী সম্পর্কেই হোক না কেন—সাড়া দিতে শেখে।" (কী করিতে হইবে?—বাংলা সংস্করণ, এন বি এ, পৃঃ ৩৭)।

এ কথার অর্থ হলো এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে গণ-তান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ও সাধারণভাবে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের, বুর্জোয়াদের জনস্বার্থ বিরোধী বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং বহু দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের এ সব দিকই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বর্তমান অবস্থায়। কিন্তু এ কাজগুলিতেই শ্রমিকশ্রেণীর রাজ-নৈতিক সংগ্রামের সব কাজ শেষ হয়ে যায় না। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সং-গ্রামের মূল কথাটা হলো মজুরি দাসত্ব ব্যবস্থার অবসান অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন। মার্কসবাদকে যারা বিকৃত করে তারা শ্রমিকশ্রেণীর এই রাজনৈতিক সংগ্রামের মূল কথাটাকে অস্বীকার করে। এদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়ে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লেনিন লিখলেনঃ

"প্রত্যেকটি শ্রেণীসংগ্রামই একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম।" (কমিউনিস্ট ম্যানি-

ফেস্টো)। আমরা জানি যে, যারা উদারনীতিবাদের ভাবধারার দাসানুদাস সেই সব সুবিধাবাদীরা মার্কসের এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বেঠিকভাবে বুঝেছিল এবং এগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিল। এই সব সুবিধাবাদীর মধ্যে বিলুপ্তবাদীদের অগ্রজ বলে যারা পরিচিত সেই অর্থনীতিবাদীরা ছিল। অর্থ-নীতিবাদীরা বিশ্বাস করতো যে, শ্রেণীগুলির মধ্যে যে কোন রকম সংঘর্ষই হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রাম। তাই রুবল প্রতি পাঁচ কোপেকের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রামকেও অর্থনীতিবাদীরা 'শ্রেণী সংগ্রাম' বলে স্বীকার করতো এবং তারা উন্নততর, অধিকতর বিকশিত দেশব্যাপী শ্রেণী সংগ্রামকে, রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য সংগ্রামকে স্বীকার করতে অস্বীকার করতো। তাই অর্থনীতিবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামের ভ্রূণ অবস্থাকে স্বীকার করতো, কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের উন্নত রূপকে স্বীকার করতে অস্বীকার করতো। অন্য কথায় অর্থনীতিবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামের শুধু সেই অংশটুকুই স্বীকার করতো যেটুকু উদারনীতিবাদী বুর্জোয়াদের কাছে অধিকতর সহনীয় ছিল; উদারনীতিবাদী বুর্জোয়াদের চেয়ে এগিয়ে যেতে তারা অস্বীকার করতো, উদারনীতিবাদী বুর্জোয়াদের কাছে যা গ্রহণযোগ্য নয় শ্রেণী-সংগ্রামের সেই উচ্চতর রূপকে স্বীকার করতে তারা অস্বীকার করতো। এভাবে কাজ করে অর্থনীতিবাদীরা উদারনীতিবাদী শ্রমিক রাজনীতিবিদ হয়ে উঠেছিল। এভাবে কাজ করে অর্থনীতিবাদীরা শ্রেণীসংগ্রামের মার্কসবাদী বিপ্লবী ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিল।

"...রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম যখন বিকশিত হয়ে ওঠে তখনই শুধু শ্রেণীসংগ্রাম প্রকৃত দৃঢ় এবং উন্নত হয়ে ওঠে এরকম ধারণা করাটাই যথেষ্ট নয়। রাজনীতিতে ও ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব, আবার অনেক গভীরে, মূল ভিত্তিতে প্রবেশ করাও যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। মার্কসবাদ শ্রেণী সংগ্রামকে তখনই শুধু সম্পূর্ণভাবে বিকশিত "দেশব্যাপী" বলে স্বীকার করে যখন শ্রেণী সংগ্রাম রাজ-নীতি অন্তর্ভুক্ত হয়েই শুধু থাকে না; রাজনীতিতে যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই রাষ্ট্রক্ষমতার সংগঠনের ক্ষেত্রেও বিকশিত হয়ে ওঠে।

"অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন যখন একটু শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তখন উদারনীতিবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামকে অস্বীকার করতে সাহস করে না। তারা তখন শ্রেণীসংগ্রামের ধারণাকে সংকুচিত করার, খণ্ডিত ও নির্বীর্য করার চেষ্টা করে। উদারনীতিবাদীরা রাজনীতির ক্ষেত্রেও শ্রেণীসংগ্রামকে স্বীকার করতে প্রস্তুত আছে, তবে একটা শর্তে—সে শর্তটা হলো এই যে, রাষ্ট্রক্ষমতার সংগঠনের ব্যাপারটি সম্বন্ধে শ্রেণী সংগ্রামের কোনো কথা তোলা যাবে না। একথা বোঝা দুষ্কর নয় যে, বুর্জোয়াদের শ্রেণী স্বার্থগুলির কোনো স্বার্থটা

রক্ষার জন্য উদারনীতিবাদীরা শ্রেণীসংগ্রামের ধারণার এহেন বিকৃতি সাধন করে থাকে।" (লেনিন : কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৯ খণ্ড, পৃঃ ১২১-১২২)।

অর্থাৎ উদারনীতিবাদীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম স্বীকার করতে রাজি আছে একটি শর্তে। সে শর্তটি হলো এই, শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে শ্রমিক-শ্রেণীর পুঁজিবাদের উচ্ছেদ করার ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার সংগ্রামের কথা থাকতে পারবে না। এখানেই উদারনীতিবাদীদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের পার্থক্য।

অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ করে বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সমস্ত বিরোধের মূল কারণটা মার্কসবাদীরা খুঁজে বের করে এবং তারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয় যে, কোনো অর্থনৈতিক সংগ্রামেই শ্রমিকশ্রেণীর কায়েমী উন্নতি সম্ভব নয়, এমন কি ব্যাপক আকারে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালানোই সম্ভব হয় না, যদি অবাধে সভা সমাবেশ করার, ইউনিয়ন গড়ার অধিকার তাদের না থাকে, লোকসভায় নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার না থাকে। এ সব অধিকার অর্জনের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে হয়। এরকম সংগ্রামের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য রাজ-নৈতিক অধিকার নয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে শ্রমিক শ্রেণীকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য তৈরী হতে হয়—তাকে তৈরী হতে হয় নিজেকে শাসক শ্রেণীর পদে উন্নীত করার জন্য, বুর্জোয়া রাষ্ট্র যন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের সেটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ রূপ।

অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে, এক ধাক্কায় রাজনৈতিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপের বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি, যে পার্টি শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক ঐ সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে।

(গ) শ্রেণী সচেতনতা

ধনতান্ত্রিক সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর মতন শ্রমিক শ্রেণীও তার স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করে থাকে। বেঁচে থাকার জন্যই শ্রমিক-শ্রেণীকে এই সংগ্রাম করতে হয়। শ্রমিকশ্রেণীর এই যে স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম এটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক, সম্পর্কেরই ফল।

ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কের মূল কথাটা হলো শ্রমিকদের, মেহনতী জনগণের শোষণ। ধনতান্ত্রিক সমাজে সমাজের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত। এরা হলো পুঁজিপতি শ্রেণী, যাদের বলা হয়

বুর্জোয়া শ্রেণী। এরাই হচ্ছে বর্তমান সমাজের উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিক—জমি, কাঁচামাল, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির মালিক। এটা হলো সমাজের একটা দিক। অপর দিকে রয়েছে ব্যাপক জনসাধারণ, যারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত, যাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কিছু নেই। এই শ্রমশক্তি উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের কাছে অর্থাৎ পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে এরা মজুরি পায় এবং সেই মজুরি দিয়েই এদের কোনো মতে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এই বিত্তহীন মজুরদের বলা হয়ে থাকে প্রলেতারিয়েত।

পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শুধু সেইটুকুই দেয় যা তাদের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক এবং তাদের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন আর সব উদ্বৃত্তই পুঁজিপতিরা নিজেদের পকেটে পোরে; এই ভাবে শ্রমিকের কাজের যে সময় তারা ব্যবহার করে তার একটি অংশের জন্যই শুধু মজুরি দেয়, আর বাকীটা সব ঐ পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ করে। পুঁজিপতি শ্রেণীর লক্ষ্য হচ্ছে বেশি বেশি মুনাফা অর্জন করা। সেই মুনাফা অর্জনের জন্য পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের নির্মমভাবে শোষণ করে, চরম দুঃখ দুর্দশা, দারিদ্র্যের মধ্যে তাদের নিক্ষেপ করে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম করতে হয়। এ সংগ্রাম শ্রমিকদের করতে হয় নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। তাই শ্রমিকদের স্বার্থের প্রশ্নটা, তাদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামটা বাস্তব অবস্থারই ফল। ধনতান্ত্রিক সমাজে যে অবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের জীবনধারণ করতে হয় সেই অবস্থার দৌলতেই শ্রমিকেরা তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।

কিন্তু তা বলে এ কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগে সংগেই শ্রমিকশ্রেণী আপনা থেকে তার স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে, সচেতন হয়ে ওঠে। একথা অবশ্য ঠিক যে, ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণীকে যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয় সেই অবস্থাটা প্রত্যেক শ্রমিকের মনে কিছু না কিছু ধারণা জাগিয়ে তোলে। প্রত্যেকটি শ্রমিকই তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অর্থনৈতিক নির্যাতন ভোগ করছে, অন্যায়, অবিচার ও সামাজিক অসাম্যের সম্মুখীন হচ্ছে। এর ফলে শ্রমিকদের মনে অসন্তোষ জাগে; সৃষ্টি হয় ক্রোধ, জাগে প্রতিবাদ জানাবার বাসনা। এই মনোভাবকে কিন্তু শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা, সজাগতা বলা চলে না। তা হলে শ্রেণী স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতার অর্থ কি, শ্রেণী সচেতনতা বলতে কি বুঝায়?

লেনিনের কথায়ঃ

"নিজের অবস্থার উন্নতি করার এবং নিজেদের মুক্তির অর্জন করার একমাত্র পথ হলো পুঁজিপতিদের এবং বড় বড় কারখানার দ্বারা সৃষ্ট কারখানার

মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা—শ্রমিকদের এই উপলব্ধিই হলো শ্রমিকদের সচেতনতার অর্থ। অধিকন্তু, কোন একটি বিশেষ দেশের সকল শ্রমিকদের স্বার্থ অভিন্ন, তাদের সকলকে নিয়েই একটি শ্রেণী গঠিত, সমাজের অন্যান্য শ্রেণী থেকে এ শ্রেণী আলাদা—শ্রমিকদের এই উপলব্ধি হলো শ্রমিকদের শ্রেণী সচেতনতার অর্থ। সর্বশেষে, শ্রমিকদের শ্রেণীসচেতনতা বলতে বুঝায় যে, শ্রমিকরা একথা উপলব্ধি করছে যে, তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে তাদের রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য কাজ করতে হবে, যেমনভাবে জমিদার আর পুঁজিপতিরা করেছিল এবং এখনো করছে।"

(কালেকটেড ওয়ার্কস : ২য় খন্ড, সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির খসড়া কর্মসূচীর ব্যাখ্যা)

শ্রমিকদের এই সচেতনতা প্রত্যেকটি শ্রমিকের মনে হঠাৎ জেগে ওঠে না, এই সচেতনতা আপনা আপনি শ্রমিকের ইচ্ছানুসারে জেগে ওঠে না। তাছাড়া নিজে একটা বিশেষ শ্রেণীর—শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিভূ এই চিন্তাধারাটা প্রত্যেকটি শ্রমিকের মনে বাসা বাঁধার প্রক্রিয়াটাও সহজ নয়, সরল নয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজে নিজের নির্যাতিত হবার মূল কারণ কি, নিজের দুঃখ দুর্দশার উৎস কোথায়—এসব সবসময়ে সব শ্রমিক বোঝে না। একজন শ্রমিক হয়ত তার নিজের দুরবস্থা দেখে ভাবতে পারে যে, এই দুরবস্থাটা তার ব্যক্তিগত ব্যর্থতারই ফল। তাই তার অসন্তোষের অভিব্যক্তি অন্যভাবে ঘটে। সে হয়তো ভাবতে পারে যে, যে-ভাবে হোক তাকে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হবে, নিজের স্বার্থরক্ষা করতে হবে, এতে যদি অন্য শ্রমিকদের সর্বনাশ হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কিছু কিছু শ্রমিক হয়ত কিছুকালের জন্য এইভাবে তাদের নিজ নিজ অবস্থার কিছুটা উন্নতি করতে পারে, নিজ নিজ দুরবস্থার কিছুটা লাঘব করতে পারে। কিন্তু কোটি কোটি শ্রমিকের অবস্থা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়। শ্রমিক আন্দোলন যখন সংগঠিতরূপ গ্রহণ করেনি তখন এ রকম চিন্তাধারা শ্রমিকের মনে জাগাটা অস্বাভাবিক নয়।

শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক রূপের আর একটা অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল শ্রমিকদের মেসিন ভাঙার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। শ্রমিকদের দুরবস্থার ফলে যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে তারা ফেটে পড়তো তার আক্রমণের বস্তু ছিল মেসিন, মেসিনের মালিকরা নয়। লেনিনের কথায় : "এরকম এক সময় ছিল যখন মূলধনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বৈরিতার অভিব্যক্তি শুধু পাওয়া যেত তাদের শোষকদের প্রতি ঘৃণার অস্পষ্ট ধারণায়, তাদের উপর যে নির্যাতন চলছে ও তাদের যে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে অস্পষ্ট চেতনায়, এবং ধনিকদের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষায়। সে সময় শ্রমিকদের

বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ঘটতো সংগ্রামের অভিব্যক্তি—শ্রমিকেরা তখন ধ্বংস করতো কারখানার অট্টালিকাগুলি, চুরমার করে ভেঙে ফেলতো মেসিনগুলি, আক্রমণ করতো কারখানার পরিচালকবর্গকে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম, প্রাথমিক রূপ ছিল ঐ, এবং সেটারও দরকার ছিল, কারণ ধনিকদের প্রতি ঘৃণাই সর্বদা ও সর্বত্র শ্রমিকদের মনে আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করার প্রথম প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" (সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির খসড়া কর্মসূচীর ব্যাখ্যা—লেনিন ঃ কালেকটেড ওয়ার্কস ২য় খণ্ড)

তা ছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর একটি জিনিসও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। পুঁজিপতিদের সম্পর্কে অস্পষ্ট ঘৃণার পরিবর্তে শ্রমিকরা যখন শ্রমিকশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধটা বুঝতে আরম্ভ করে তখন পুঁজিপতিরা নতুন কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে। শ্রমিকেরা নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ সম্বন্ধে যাতে সচেতন হয়ে না উঠতে পারে তার জন্য পুঁজিপতিরা, ঐ বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের উপর বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার জন্য বুর্জোয়ারা এই কথাই প্রচার করে থাকে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চিরকাল বজায় থাকবে, আর সমাজে ধনী ও গরিব চিরকাল ধরে আছে এবং থাকবে, এ সবই হচ্ছে বিধির বিধান—এ ব্যবস্থা পাল্টাবার সাধ্য কারুর নেই। বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের মধ্যে এ কথাও প্রচার করে যে, মালিকের সঙ্গে আপস আলোচনা করেই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব, সংগ্রাম করে নয়। তাছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও বুর্জোয়ারা করে থাকে। বুর্জোয়াদের এই কৌশল প্রয়োগের ফলে শ্রমিকদের শ্রেণী সচেতনতার পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

তাই শ্রমিক শ্রেণীর, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সচেতনতাগড়ে ওঠা এক জটিল প্রক্রিয়া বিশেষ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী এই প্রক্রিয়া ধীরে বা দ্রুতগতিতে, সহজে বা বাধাবিপত্তির মধ্যে চলে থাকে। যেখানে শ্রমিক শ্রেণী তার বিকাশের নিম্নস্তরে রয়ে গিয়েছে সেখানে এই প্রক্রিয়া চলেছে ধীর গতিতে নানারকম বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে। কিন্তু যেখানে আন্দোলনের ফলে শ্রমিক শ্রেণী তার বিকাশের উচ্চ স্তরে পেঁছাতে শুরু করেছে সেখানে এই প্রক্রিয়া চলেছে দ্রুতগতিতে।

শ্রমিকদের শ্রেণী সচেতনতা বিকশিত হবার শ্রেষ্ঠ স্কুল হচ্ছে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রাম—তাদের আশু স্বার্থের জন্য সংগ্রামও এই সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা নিজেদের বাঁচার তাগিদে সংগ্রাম করতে বাধ্য হয় এবং সেই সংগ্রাম ক্রমাগতই বিকাশ লাভ করে, তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং বড় বড় কারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সে সঙ্গে সংগ্রামে অনেক বেশি সংখ্যক শ্রমিক লিপ্ত

হয়। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে শ্রমিকের ঐক্য এবং এই সংগ্রাম থেকে অবিরত অভিজ্ঞতা অর্জন করেই শ্রমিকেরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে, নিজেদের সংগ্রামের ধারা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ; এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাদের শ্রেণী সচেতনা বিকাশ লাভ করে।

কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লব্ধ এই শ্রেণী সচেতনতাটুকুই যথেষ্ট নয়। এই শ্রেণী সচেতনতা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন চেতনা।

"সমস্ত দেশের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, একমাত্র নিজের চেষ্টায় শ্রমিকশ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার বিকাশে সক্ষম। অর্থাৎ নিজে নিজে সে ইউনিয়নগুলির ভিতর সম্মিলিত হবার, মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে, প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে দরকারী শ্রম আইন পাস করাতে সরকারকে বাধ্য করতে"। (লেনিন ঃ কী করিতে হইবে ?)

শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে উচ্চস্তরের শ্রেণী সচেতনতা— সমাজতান্ত্রিক চেতনা। চেতনার এই স্তরে পৌঁছাতে গেলে শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের মতাদর্শগত সংগ্রামের রূপের।

(ঘ) মতাদর্শগত সংগ্রাম

শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসচেতনতাকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার স্তরে উন্নীত করার কথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু কিভাবে এ কর্তব্য সম্পন্ন করা যাবে ? এটা তো প্রশ্নাতীত যে, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসচেতনতাকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার স্তরে উন্নীত করতে না পারলে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করা যেতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক চেতনা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসচেতনতার বিকাশের এক উচ্চস্তর। আশু স্বার্থের জন্য সংগ্রাম সমেত শ্রমিকদের দৈনন্দিন সংগ্রাম যে শ্রেণীসচেতনতা জাগ্রত করার সেরা বিদ্যালয় সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক চেতনার স্তরে পৌঁছাতে গেলে এইটুকুই, অর্থাৎ এই দৈনন্দিন সংগ্রামই যথেষ্ট নয় ; শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসচেতনতাকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার স্তরে উন্নীত করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের মতাদর্শগত সংগ্রামের।

যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন সেই চেতনা একমাত্র নিজের চেষ্টায় শ্রমিকশ্রেণী বিকশিত করতে সক্ষম নয়। সকল দেশেরই ইতিহাসে দেখা যায় যে, একমাত্র নিজের চেষ্টায় শ্রমিকশ্রেণী শুধু ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার বিকাশ ঘটাতেই সক্ষম। সমাজতান্ত্রিক

চেতনা শ্রমিকদের মধ্যে আনা যায় এবং আনতে হয় বাইরে থেকে। সেই সমাজতান্ত্রিক চেতনায় শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া যে শ্রমিকশ্রেণীর মজুরি দাসত্ব থেকে মুক্তি নেই সেই চেতনা শ্রমিকদের মধ্যে জাগ্রত করে তুলতে হয় এবং তার জন্য তাদের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায়, চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সর্বরকম বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। তাই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে মতাদর্শগত সংগ্রামের। সে সংগ্রাম বাদ দিয়ে ভাষণে শুধু সমাজতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করার কথা বললেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটবে না।

কিন্তু এই মতাদর্শগত সংগ্রামটা কি? এটা হচ্ছে এমন একটা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, এমন একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করা যা শ্রমিকশ্রেণীকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণের অক্টোপাস থেকে মুক্তির পথ দেখাবে। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদ। আশু দাবি আদায়ের জন্য পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর যে সংগ্রাম চলে সেই সংগ্রাম বিশেষ করে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক মতবাদের অভ্যুদয় ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শুধু উন্নত দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই সমাজতন্ত্রের মতবাদের, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। এ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। এ সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য শ্রমিক আন্দোলনের প্রত্যেকটি নেতা ও কর্মীর স্মরণ রাখা দরকার। লেনিন বলেছিলেন: "...সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্ব সম্পত্তিশালী শ্রেণীর প্রতিনিধি বুদ্ধিজীবীদের দার্শনিক, ঐতিহাসিক আর অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্গাতা মার্কস ও এঙ্গেলস সামাজিক পদমর্যাদার দিক থেকে ছিলেন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোক" (লেনিন: "কী করিতে হইবে"—এন বি-এর বাংলা সংস্করণ, পৃ: ১৩-১৪)।

এই প্রসঙ্গে ঐ পুস্তকের আর এক জায়গায় লেনিন লিখলেন: "অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে এ রকম একটা মতাদর্শ সৃষ্টিতে শ্রমিকদের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু তারা এতে অংশ গ্রহণ করে শ্রমিক হিসেবে নয়, প্রুধো এবং ওয়াইটলিং-এর মতো সমাজতন্ত্রী তত্ত্বজ্ঞ হিসাবে। অন্য কথায় তারা ততোখানিই অংশ গ্রহণ করে, কম-বেশি যতখানিই তারা যুগোপযোগী জ্ঞান আহরণ করতে পারে আর অগ্রসর করে নিয়ে যেতে পারে সেই জ্ঞানকে।" (ঐ, পৃ: ২৩)।

মার্কস ও এঙ্গেলসই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির পথ নির্দেশ করলেন। তাঁরাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। ইউটোপীয়ান বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের,

নৈরাজ্যবাদের তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁরাই প্রতিষ্ঠিত করলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি কিভাবে আনতে হবে সেই রণকৌশলও শ্রমিকশ্রেণীকে তাঁরা দেখিয়ে দিলেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যে তত্ত্ব প্রচার করলেন সেই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে ঘোষিত হলো শ্রমিকশ্রেণীর মূল স্বার্থের কথা—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শাসন ও শোষণ থেকে, মজুরি দাসত্বের শৃংখল থেকে তাদের মুক্তির প্রয়োজনের কথা; আর ঘোষিত হলো এই লক্ষ্য সাধনের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অর্জনের পথ। সে পথ হলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজতন্ত্রের ভাবধারা, চিন্তাধারা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিয়ে যেতে হবে, এই চিন্তাধারায় তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে। এ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির, কমিউনিস্ট পার্টির। এই পার্টি গড়ার নির্দেশও মার্কস-এংগেলস দিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব প্রচারের সংগে সংগে তাঁরা দেখালেন যে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির, কমিউনিস্ট পার্টির।

কিন্তু মার্কস-এংগেলসের শিক্ষা কোনও আপ্তবাক্য নয়। তাঁদের শিক্ষা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে পথ নির্দেশক। মার্কস-এংগেলস যে তত্ত্ব প্রচার করেছেন সে-তত্ত্ব হলো সমাজবিকাশের তত্ত্ব, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের তত্ত্ব, শোষণহীন সমাজ প্রবর্তনের তত্ত্ব, শ্রমিকশ্রেণীকে শাসক শ্রেণীর পদে উন্নীত করার তত্ত্ব, প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব হচ্ছে একটি বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান হিসাবে ইহা একস্থানে নিশ্চল হয়ে থাকে না, থাকতে পারে না, বরং ইহা ক্রমশ বিকাশ লাভ করে। এই বিকাশের পথে এই তত্ত্ব নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেই, এর কিছু সংজ্ঞা ও নির্দেশ কালের পরিবর্তনের সংগে সংগে বদলাতে বাধ্য, নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সংগে খাপ খাইয়ে নতুন সিদ্ধান্ত ও সংজ্ঞা পুরাতনের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। যারা মার্কসবাদের এই মর্মকথাটা বোঝে না তারা মার্কসবাদের আক্ষরিক বিশুদ্ধতার ধুয়ো তুলে মার্কসবাদকে বিপ্লবী আন্দোলনের নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন সংজ্ঞা, নতুন ধারণা দিয়ে সমৃদ্ধ করতে নারাজ। এদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে মার্কসবাদের বিকাশ ও অগ্রগতি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিকে ঘটাতে হয়। এটা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজ হচ্ছে মার্কসবাদকে বিকশিত করার কাজ।

মার্কসবাদের এই তত্ত্বকে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে

শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামে তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। এই ভূমিকা পালন কবতে হলে মার্কসবাদকে, শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপক শ্রমিক জনসাধারণের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ শ্রমিক জনসাধারণের ব্যাপক অংশ যাতে মার্কসবাদে, শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্যই প্রয়োজন হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বাইরে থেকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের ক্ষেত্রের বাইরে থেকে—শ্রমিকশ্রেণীর এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করতে হবে, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে—নিয়ে আসতে হবে বাইরে থেকে সমাজতান্ত্রিক চেতনা। এ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির, কমিউনিস্ট পার্টির। মনে রাখা দরকার যে, পার্টি হচ্ছে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ভাবধারার সংযুক্তিকরণ।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিকেই শ্রমিক-আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রবর্তন করতে হবে। এ কথাই লেনিন ও স্তালিন বারবার বলেছেন। "প্রবর্তন" শব্দটি থেকেই এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক চেতনা বাইরে থেকেই শ্রমিক আন্দোলনে নিয়ে আসতে হবে এবং এ কর্তব্য শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিকে, কমিউনিস্ট পার্টিকে সুসম্পন্ন করতে হবে। এই জন্যই প্রয়োজন হচ্ছে মতাদর্শগত সংগ্রামের। এক কথায় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে মতাদর্শগত সংগ্রামের। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিকে, কমিউনিস্ট পার্টিকেই এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

এই মতাদর্শগত সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির, তাদের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। শ্রেণীশত্রুরা মার্কসবাদকে, শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবী তত্ত্বকে বিকৃত করার চেষ্টা করে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের হাতিয়ারকে ভোঁতা করে দেবার জন্য। শ্রেণীশত্রুদের অর্থাৎ পুঁজিপতিদের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যাবে যে, মার্কসবাদ যখন শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের মতাদর্শগত শক্তি হয়ে উঠলো, তখন পুঁজিবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য দুটি কৌশল অবলম্বন করলো। একদিকে তারা শ্রমিক আন্দোলনকে দাবিয়ে দেবার জন্য খোলাখুলিভাবে সংগ্রাম চালালো। আর একদিকে ভিতর থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য, ভোঁতা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিজেদের এজেন্ট ঢুকিয়ে দিল। এই সব এজেন্টদের কাজ হলো

মার্কসবাদকে 'উন্নত' করার নামে, "সময়োপযোগী" করার নামে মার্কসবাদকে নিবীর্য করার চেষ্টা করা।

এই সব এজেন্টরা মার্কসবাদকে সংশোধন করার অভিযানে নেমে শ্রমিক-শ্রেণীকে বিপ্লবের পথ থেকে, শ্রেণীসংগ্রামের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার নানারকম তত্ত্বকথা প্রচার করতে থাকে। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটা রাজনৈতিকভাবে সচেতন শ্রমিকদের এবং সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির অবশ্য কর্তব্য। তাই মার্কসবাদকে যারা বিকৃত করার, সংশোধন করার চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আবার শ্রমিক আন্দোলনে মাঝে মাঝে 'হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা' একদল অতিবিপ্লবীর আবির্ভাব ঘটে। এরা বাস্তব অবস্থার পরিবর্তে নিছক অভিলাষকেই বিপ্লবের ক্রিয়াশক্তি হিসাবে মনে করে থাকে। এরা বিপ্লবের বুলি আওড়ায়, আর এক্ষুণি বিপ্লব চায়। এরা হচ্ছে সংকীর্ণতাবাদী। এদের বিরুদ্ধেও মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া রাজনৈতিকভাবে সচেতন শ্রমিকদের, সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির অবশ্য কর্তব্য। এই মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে না পারলে শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রবর্তন করা যাবে না। এই কথাটা আমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার।

শুধু শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রবর্তনের জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম করাটাই যথেষ্ট নয়। শ্রমিকশ্রেণীকে তার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হবে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসানের জন্য অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য। এজন্য শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজের মেহনতী জনগণকে কৃষক ও মধ্যবিত্তদের তার সংগ্রামের মিত্র করতে হবে। ধনতন্ত্রের শাসন শোষণে জর্জরিত, নির্যাতিত সকল শক্তিকে শ্রমিকশ্রেণীর পতাকাতলে সমবেত করতে হবে এবং তাদের পরিচালিত করতে হবে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য। এজন্য সমগ্র মেহনতী জনগণের মধ্যে কৃষক, মধ্যবিত্তদের মধ্যে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভাবধারা প্রচার করতে হবে। অর্থাৎ তাদেরও সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ কাজের দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিকে গ্রহণ করতে হবে এবং এ দায়িত্ব পালনের জন্য এ ক্ষেত্রেও পার্টিকে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

তাই মনে রাখা দরকার যে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শগত সংগ্রাম শ্রেণীচেতনা, সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকশিত করার এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মার্কসবাদ প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শ্রমিকশ্রেণী তার মুক্তি সংগ্রাম সমাজের অন্যান্য মেহনতী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিচালিত করে না, তারা তাদের মুক্তি সংগ্রাম পরি-

চালিত করে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সংগে হাত মিলিয়ে এবং তারাই থাকে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের পুরোভাগে। সে জন্যই এই সব শ্রমজীবী জনগণকে—কৃষক, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য এবং তাদের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার দিকে জয় করে আনার, তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রবর্তনের কাজটাও শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শগত সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(ঙ) প্রলেতারীয় বিপ্লব

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে প্রলেতারীয় বিপ্লব যার রূপটা হলো সমাজতান্ত্রিক। সেজন্য এ বিপ্লবকে আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়ে থাকে। মার্কস ও এংগেলস "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"তে এই বিপ্লবের কথাই বলেছেন। এই বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ হলো শ্রমিক শ্রেণীকে শাসক শ্রেণীর পদে উন্নীত করা এবং গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ আর রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রলেতারিয়েতের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা শ্রেণীসংগ্রামের শীর্ষস্তরেরই ফল। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের এই শীর্ষ স্তরটা হচ্ছে প্রলেতারীয় বিপ্লব।

এই প্রলেতারীয় বিপ্লবের আবির্ভাব আমরা প্রথম দেখি রুশদেশে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যের মধ্যে। মানব জাতির ইতিহাসে আগে যে সব বিপ্লব ঘটেছে সেগুলির সংগে এ বিপ্লবের রয়েছে বিরাট পার্থক্য। অতীতের সমস্ত বিপ্লবেই একদল শোষকের শাসনের কর্তৃত্বের অবসান করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর একদল শোষকের শাসন কর্তৃত্ব। সে সব বিপ্লবে শুধু একদল শোষক আর একদল শোষককে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল, কিন্তু জনগণকে শোষণ করার প্রথা অপরিবর্তিতই ছিল। এ ভাবেই দাস মালিকদের সমাজব্যবস্থার জায়গায় এসেছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। আবার সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জায়গায় এলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এভাবে সমাজে বিপ্লবের মাধ্যমে এলো এক শ্রেণীর শোষকের পরিবর্তে আর এক শ্রেণীর শোষক।

যে বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। এরকম বিপ্লবই ঘটেছিল ১৭৮৯ সালে ফরাসী দেশে—সে বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। সেদিন বুর্জোয়াশ্রেণীই দখল করেছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা, প্রবর্তন করেছিল নয়া শোষণ ব্যবস্থা, মজুরীদাসত্ব ব্যবস্থা। কিন্তু ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রুশদেশে যে মহান বিপ্লব ঘটলো সে বিপ্লব ছিল প্রলেতারীয় বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। একদল শোষকের জায়গায় আর

একদল শোষককে বসানো, একরকম শোষণের পরিবর্তে আর এক ধরনের শোষণের প্রবর্তন করা সে-বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল না। সেই মহান নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের সকলরকম শোষণের অবসান করা, সমস্ত শোষকশ্রেণীর উচ্ছেদ করা। শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে যারা সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী সেই শ্রমিকশ্রেণীর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ; উৎপাদনের উপায় সমূহকে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা। এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-শ্রেণীই হচ্ছে প্রধান চালিকাশক্তি ; শ্রমিকশ্রেণীই এ বিপ্লবে নেতৃত্ব করেছিল।

প্রলেতারীয় বিপ্লবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মেহনতী জনগণ এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। দাস-মালিকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবে এবং সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে বিপ্লবে মেহনতী জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল সত্য, কিন্তু সে দুটো বিপ্লবেই মেহনতী জনগণের নিজস্ব কোনো বিশেষ ভূমিকা ছিল না। তারা কাজ করেছিল নবীন শোষকশ্রেণীর বাহিনী হিসাবে। সে দুটো বিপ্লবেই সেই সময়কার ক্ষমতাসীন শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদ করে নতুন শোষকশ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময়ে মেহনতী জনগণের ভূমিকা ছিল নতুন শোষকশ্রেণীর ক্ষমতায় আসার পথ উন্মুক্ত করা। সে দুটো বিপ্লবেই একরকমের শোষণের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর এক রকমের শোষণ ব্যবস্থা।

কিন্তু প্রলেতারীয় বিপ্লব, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে অন্য ধরনের বিপ্লব। এই বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণী এবং মেহনতী জনগণের অন্যান্য অংশ বিপুল সংখ্যায় যোগদান করে। এক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর রয়েছে একটা বিপ্লবী ভূমিকা। তারাই হচ্ছে এ বিপ্লবের প্রধান শক্তি, এ বিপ্লবের নেতা। তারা এ বিপ্লবে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান করার জন্য নিজেদের পতাকাতলে মেহনতী জনগণের সকল অংশকে সমাবেশ করে। নিজের মুক্তির জন্য শুধু নয়, শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম করে শোষণের অক্টোপাশ থেকে সমগ্র মানব সমাজের মুক্তির জন্য।

প্রলেতারীয় বিপ্লবের, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক কর্তব্য হলো উৎপাদনের উপায়সমূহে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মালিকানার এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের অবসান ঘটানো এবং তার জায়গায় উৎপাদনের উপায়সমূহে সমাজের মালিকানা ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিস্থাপিত করা।

যতদিন বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে বসে থাকবে ততদিন এ কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করার পথে প্রধান বাধা

হলো বুর্জোয়া রাষ্ট্র। বুর্জোয়া রাষ্ট্রই বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে থাকে, তাদের সম্পত্তি রক্ষা করে থাকে। তাই উৎপাদনের উপায় সমূহে পুঁজিবাদীদের অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাতে হলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংগে প্রলেতারিয়েতের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। বুর্জোয়া শ্রেণী স্বেচ্ছায় শান্তিপূর্ণভাবে উৎপাদনের উপায়সমূহে তাদের মালিকানা ছেড়ে দেবে না। সেজন্যই উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এখন উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর যাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত সেই পুঁজিপতি শ্রেণীর (বুর্জোয়া শ্রেণীর) কাছ থেকে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা ছিনিয়ে আনতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতায় পুঁজিপতি শ্রেণীর কর্তৃত্বের প্রভুত্বের অবসান করা। সেটা করতে শ্রমিক শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম গড়ে তোলা শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান কর্তব্য, অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশে এ সংগ্রামের রূপ হবে বিভিন্ন। এই হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের সর্বোচ্চ স্তর।

আজকাল জনগণের দুঃখ দুর্দশা, তাদের শোচনীয় অবস্থা দেখে অনেকেই বলে থাকেন যে, বর্তমান সমাজে একটা মূলগত পরিবর্তন আনা দরকার। উৎপাদন ব্যবস্থার অরাজকতা তারা প্রত্যক্ষ করেন। তারা দেখেন যে, কয়েক বছর অন্তর পালা করে আসে অর্থনৈতিক সংকট, বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থের সংঘাতে দেখা দেয় যুদ্ধ, ধ্বংসের আবর্তে নিমজ্জিত হয় সাধারণ মানুষ। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার পথের সন্ধান তাঁরা করেন। যেখানে জনগণের হিতার্থে সমাজ উৎপাদনের উপায়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করবে ও সংগঠিত করবে, এ রকম সুসংগঠিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যের সংগে তাঁরা একমত নন। তাঁরা আবার অনেক সময় কমিউনিজমের লক্ষ্যের কথাও বলেন। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে, সেই সংগ্রামের অবস্থার সম্মুখীন হতে তাঁরা প্রস্তুত নন। তাঁরা প্রশ্ন করেন: "কেন শ্রেণী সংগ্রাম? কেন বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ? শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথাই বা ওঠে কেন? এ সব পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে সকল মানুষের সহযোগিতায় নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কাজ কী ব্যাহত হবে না?"

এই সব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এঁদের চিন্তার দৈন্যই ফুটে ওঠে। এঁরা এখনো উপলব্ধি করতে পারছে না যে, সমাজের রূপান্তরের ও পুনর্গঠনের মূল সমস্যা হলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সমস্যা। সমাজের রূপান্তর ঘটাতে হলে এ সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে।

বর্তমান সমাজব্যবস্থার চরিত্রটা আমরা নিজেদের চোখের সামনেই দেখছি। বর্তমান সমাজের অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজের শাসক হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী। সেই শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রকৃত প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বেই বর্তমান সমাজব্যবস্থা চলছে। পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের শাসন ক্ষমতা, শোষণের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সর্বরকম পন্থাই অবলম্বন করে থাকে, বলপ্রয়োগ করতে তারা কখনো দ্বিধা করে না। নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তাঁরা জনগণের উপর নিষ্ঠুর দমননীতি চালায় এবং সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করে; তারা মোটেই অহিংসার পূজারী নয়, বরং তারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হিংসাশ্রয়ী, নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তারা হিংসাত্মক কার্যকলাপই চালিয়ে থাকে।

উৎপাদনের উপায়সমূহকে সমাজের মালিকানায় নিয়ে আসতে হলে, সেগুলিকে সামাজিক উৎপাদনের উপায় হিসাবে সংগঠিত করতে হলে পুঁজিপতি শ্রেণীর এই ক্ষমতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা দরকার। পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে শক্তি হিসাবে যে শ্রেণী ধনতান্ত্রিক সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং সংগ্রামের ধারার মধ্য দিয়ে শ্রেণী সচেতন হয়ে উঠছে সেই শ্রমিকশ্রেণীই পুঁজিপতি শ্রেণীর এই ক্ষমতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে পারে এবং করবেও। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে— বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্য। এই হচ্ছে মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষা।

১৩

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বলতে কি বুঝায়?

প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বলতে কি বুঝায়? কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব?

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটাবে শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐতিহাসিক কর্তব্যের উপর মার্কস ও এঙ্গেলস বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতেই তাঁরা বলেছিলেন: "যে অস্ত্রে তাদের মৃত্যু বুর্জোয়াশ্রেণী শুধু সেই অস্ত্রটুকুই গড়েনি, এমন লোকও তারা সৃষ্টি করেছে যারা সে অস্ত্র ধারণ করবে, সৃষ্টি করেছে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীকে, প্রলেতারিয়েতকে"।..."যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী

উৎপাদন করে ও উৎপন্ন সামগ্রী দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্জোয়াশ্রেণী সৃষ্টি করেছে সর্বোপরি তার সমাধিখনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুই-ই সমান অনিবার্য।"

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে ঘোষিত হয়েছে প্রলেতারিয়েতের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা। প্রলেতারিয়েতই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করবে এবং প্রতিষ্ঠিত করবে নতুন সমাজব্যবস্থা—সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বক্তব্যের বাস্তব রূপায়ণই আমরা দেখেছি বিংশ শতাব্দীতে। রুশদেশের নভেম্বর বিপ্লবের বিজয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে প্রতিষ্ঠিত হলো সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। তারপর থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার অভিযান এগিয়ে চলেছে দেশে দেশে। আজ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা একটা বা দুটো দেশের ব্যাপার নয়। আজ সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার পাশাপাশি বিরাজ করছে একটি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া। আজ পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা—সে ব্যবস্থায় বসবাস করছে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ। এই সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে। এ সব দেশে বুর্জোয়ারা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয়নি। সবলে তাদের উচ্ছেদ করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করেই শ্রমিকশ্রেণীকে অগ্রসর হতে হয়েছে; বিপ্লবের মাধ্যমেই তাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ উন্মুক্ত করতে হয়েছে এবং সেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তাদেরই নেতৃত্বে। এভাবেই শ্রমিকশ্রেণী তার ঐতিহাসিক কর্তব্য ঐসব দেশে সম্পন্ন করেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐতিহাসিক কর্তব্যের সারকথা হচ্ছে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ব্যবস্থার অবসান করা, উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান করে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা এবং এর জন্য ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করা দরকার। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র শ্রেণী যারা অবিচলভাবে সংগ্রাম করে শোষণের মূলভিত্তির বিরুদ্ধে, কেননা ধনতান্ত্রিক সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে শ্রমিকশ্রেণীই শোষণের যাঁতাকলে বেশি পিষ্ট হয়। শ্রমিকশ্রেণীকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে। তাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম দিনের পর দিন তীব্র হয়ে ওঠে। কারণ, তারা প্রতিদিনই শোষণের জ্বালা অনুভব করে এবং যতই দিন যায় ততই নিজেদের দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, দাবি দাওয়া আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে,

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হচ্ছে শোষণের উৎস এবং এই ব্যবস্থার অবসান করতে না পারলে তাদের মুক্তি নেই।

শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। মুক্তির জন্য শ্রমিকশ্রেণীর যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের অর্থ কেবলমাত্র নিজেদের শ্রেণীগত সুবিধা বা শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকারের জন্য সংগ্রাম নয়, সে সংগ্রাম হচ্ছে সমান অধিকারের জন্য এবং সমস্ত শ্রেণী-আধিপত্যের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম; সে সংগ্রাম হচ্ছে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটাবার সংগ্রাম। এ সংগ্রামের বিজয়ের মধ্য দিয়ে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিই নয়, সমগ্র মেহনতী জনগণের মুক্তিও ঘোষিত হবে, ঘোষিত হবে শোষণের শৃঙ্খল থেকে মানব সমাজের মুক্তি।

শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামের এই তাৎপর্যের কথা যেদিন মার্কস ও এঙ্গেলস ঘোষণা করেছিলেন তারপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে। বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের এই সংগ্রামের বিজয়বার্তাই ঘোষিত হয়েছে—পৃথিবীর এক বিরাট অংশে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের অনিবার্য নিয়মানুসারে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই তাদের সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাদের সংগ্রাম বিস্তৃত হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, গড়ে উঠেছে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন, তাদের বিপ্লবী পার্টি।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি তার সংখ্যার মধ্যে, শ্রেণী সচেতনতা এবং তার রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যেই শুধু নিহিত নয়। সমাজের সমস্ত শ্রমজীবী জনসাধারণের, বিশেষ করে কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের ঐক্যের মধ্যেও নিহিত রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি। এই যে স্বার্থের ঐক্য এর ভিত্তি রয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থার মধ্যে। পুঁজিবাদের নিষ্ঠুর শোষণে শুধু শ্রমিকেরা নয়, ব্যাপক কৃষক জনগণ, শহরের মধ্যবিত্তরা, অফিসের কর্মচারীরাও জর্জরিত হচ্ছে। পুঁজিবাদ যতই বিকশিত হয়েছে ততই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে শাসক বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের যাঁতাকলে সমাজের আরও বেশি বেশি অংশ পিষ্ট হচ্ছে, তাদের জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠছে। তারা চিনছে তাদের শত্রু, উপলব্ধি করছে তাদের স্বার্থের উপর কারা আঘাত হানছে। নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করছে। একই শত্রু, একই স্বার্থ—এই বাস্তব ঘটনাই বুর্জোয়া শাসন-শোষণের বিরোধী হয়ে উঠছে যে সব শ্রেণী তাদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্যের বাস্তব ভিত্তি রচনা করছে।

এই সংগ্রামী ঐক্যের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক দেশে, এমনকি যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা কম সেই সব দেশেও, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের বিজয় সম্ভব হয়েছে। এই সংগ্রামী ঐক্যের পুরোভাগে শ্রমিক-শ্রেণী ছিল বলেই এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল বলেই এই বিজয় সম্ভব হয়েছে। রুশ বিপ্লবের ও চীন বিপ্লবের মধ্য দিয়েই এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে ; চীনের এবং কয়েকটি জনগণতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ সেখানেও জন-সংখ্যার ব্যাপক জনগণের সংগে বিশেষ করে কৃষকদের সংগে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সংগ্রামী ঐক্য স্থাপন করে শ্রমিকশ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত করে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবও কার্যকর করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্যান্য শ্রমজীবী জন-সাধারণের যে মনোভাবই থাকুক না কেন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায়, বিশেষ করে যেখানে সামন্ততন্ত্রের মধ্যযুগীয় অবশেষ বিদ্যমান সেখানে এমন অনেক বিষয় আছে যাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণ শ্রমিকদের সংগে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম করতে চায় এবং এই সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে। অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি বিষয় নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে এবং শ্রমিকশ্রেণীকেই এ রকম সংগ্রাম গড়ে তোলার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং ঐ সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে হবে।

মনে রাখা দরকার, আশু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যের মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের মৌলিক স্বার্থ সীমাবদ্ধ নয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আজ ব্যাপকতম মেহনতী জনসাধারণের সংগ্রামের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। তারাও আজ একথা বুঝতে আরম্ভ করেছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ না করতে পারলে তাদের অসহনীয় অবস্থার যবনিকা টানা যাবে না, তাদের দুঃখ দুর্দশার অবসান করা যাবে না।

অত্যাচার উৎপীড়নের, শোষণের সর্বরকম রূপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে শ্রমিকশ্রেণী সমগ্র সমাজকেই মুক্ত করছে অত্যাচার, উৎপীড়নের, শোষণের সব-রকম রূপ থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর এই মার্কসীয় তত্ত্ব আজ শুধু কথাই নয়, বাস্তব জীবনে এই তত্ত্ব আজ প্রমাণিত, সুপ্রতিষ্ঠিত। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আবির্ভাবই তার সাক্ষ্য বহন করছে। তাই

আজ সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে এসে শ্রমজীবী জনসাধারণের অন্যান্য অংশও সমবেত হচ্ছে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার দেশে দেশে আজ কৃষক সম্প্রদায় সামন্ততন্ত্রের অবশেষের বা পুঁজিবাদের নির্যাতনে বা সামন্ততন্ত্রের অবশেষ ও পুঁজিবাদ উভয়ের নির্যাতনে জর্জরিত হচ্ছে। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কৃষক সম্প্রদায় এই সত্যে উপনীত হচ্ছে যে, পুঁজিবাদ তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারে না; তারা দেখেছে যে, কৃষিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের ফলে জমি থেকে তারা উচ্ছেদ হচ্ছে, তারা নিঃস্ব হচ্ছে এবং তারা আরো বেশি বেশি করে ভূমিহীন কৃষি মজুরে পরিণত হচ্ছে। কেবল মাত্র সমাজতন্ত্রই তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কৃষকদের জীবন যাত্রাই তাদের মুক্তির পথের সন্ধান দিচ্ছে।

মধ্যবিত্তরাও দেখছে যে, পুঁজিবাদের শোষণে তারাও দিনের পর দিন গরিব হচ্ছে; তারাও উপলব্ধি করছে যে, পুঁজিবাদ তাদের জীবনের সমস্যারও সমাধান করতে পারছে না। তারাও সংগ্রামে শামিল হচ্ছে। মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের সংগ্রামী রূপ আজ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তারাও অনুভব করছে। সমাজতন্ত্র ছাড়া যে শোষণ থেকে মুক্তি নেই এ সত্য তারাও উপলব্ধি করছে।

তাই আজকের দিনের বাস্তব পরিস্থিতিই সমাজের এই সব অংশের, বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী মৈত্রীর অনুকূলে অবস্থা সৃষ্টি করছে। এই সংগ্রামী মৈত্রীতে শ্রমিকশ্রেণীকে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে—সে ভূমিকা হলো নেতৃত্বের ভূমিকা।

শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের অর্থাৎ অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের বিশেষ করে কৃষকদের স্বার্থেই শ্রমিকশ্রেণীর এই নেতৃত্ব প্রয়োজন। কেননা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই তারা পুঁজিপতিদের ও জমিদারদের পরাস্ত করতে পারে। মার্কস ও এঙ্গেলসের কথায়ঃ "আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখোমুখি যে সব শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েত হলো প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী"।

প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীই হল একমাত্র শ্রেণী যারা পুঁজিবাদের অত্যাচার, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম। অধিকন্তু সেই শ্রেণীর রয়েছে সমাজকে পুনর্গঠিত করার, শোষণের অবসান করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব কর্মসূচী। তাছাড়া কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী পারে সেই রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তুলতে যে পার্টির থাকবে বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি এবং যে পার্টি মানব জাতির মুক্তির লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম, অর্থাৎ যে পার্টি মার্কসবাদের তত্ত্বে সমৃদ্ধ এবং

মার্কসবাদের দ্বারা কর্মক্ষেত্রে পরিচালিত। কিন্তু এই প্রশ্নের সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির মধ্য দিয়ে, অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের বিশেষ করে কৃষকদের সংগ্রামে পার্টি নেতৃত্ব মারফত কার্যকরী হয় না। বাস্তবিক পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কার্যকরী হয় কাজের মধ্য দিয়ে, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের বিশেষ করে কৃষকদের দাবিদাওয়ার সুদৃঢ় সমর্থনের মধ্য দিয়ে এবং শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক এদের সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে।

শ্রমিক শ্রেণীর নিজের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রামে তার নেতৃত্ব করাটা হচ্ছে তার নিজের মুক্তিকে জয় করে আনার পক্ষে একটা গ্যারান্টি বিশেষ, কেননা, এই নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের কর্তব্য সুসম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী তার দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সংগ্রামের, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সংগ্রামে সংকীর্ণ গন্ডী ডিঙিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক সংগ্রামের, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদের সংগ্রামের নেতৃত্বের ভূমিকায় উন্নীত করতে পারে।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্ন সম্বন্ধে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই কথাটা আজ স্মরণ করা দরকার। রুশ দেশের বিপ্লবের সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন বারবার শ্রমিকশ্রেণীকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, রুশ দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত হয়নি এবং শ্রমিকশ্রেণীকেই সেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীকেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।

১৯১১ সালে লেনিন পরিষ্কার ভাবে লিখলেন : "বর্তমান সমাজে অটল বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সমগ্র জনসাধারণের সংগ্রামে, অত্যাচারীদের ও শোষকদের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমজীবী ও শোষিত জনসাধারণের সংগ্রামে নেতা হয়ে উঠতে হবে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের এই ধারণা সম্বন্ধে শ্রমিক শ্রেণী যতটা সচেতন থাকবে এবং এই ধারণাকে যতটা কার্যকরী করবে শুধুমাত্র সেই মানদণ্ডেই শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবী বলা হবে। যে শ্রমিক এই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন সে হচ্ছে সেই ক্রীতদাস যে ক্রীতদাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। নিজের শ্রেণীকে নেতা হতে হবে—এই ধারণা সম্বন্ধে যে শ্রমিক সচেতন নয় বা যে শ্রমিক এই ধারণা বর্জন করে সে হচ্ছে সেই ক্রীতদাস যে ক্রীতদাস হিসাবে নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করছে না। বড় জোর সে হচ্ছে সেই ক্রীতদাস যে ক্রীতদাস হিসাবে তার অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম করে কিন্তু সে সেই রকম ব্যক্তি নয় যে ক্রীতদাস ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করে। (লেনিন রচনাবলী, ১৭ খণ্ড, পৃঃ ২৩১-৩২)

লেনিনের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের যে গুরুত্ব, তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা আমাদের গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে লেনিনের শিক্ষাকে প্রয়োগ করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকাকে যথোপযুক্তভাবে বিকশিত করে তুলতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে আমাদের দেশের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাপ্ত করতে হবে এবং তারপর এগিয়ে যেতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কি ভাবে কার্যকরী করা হয় তা আমাদের কর্মনীতিতে বলা হয়েছে। সে বক্তব্য আমাদের সব সময়ে স্মরণ রাখতে হবে।

সে বক্তব্য হলো ঃ

"শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব শুধুমাত্র পার্টির মধ্য দিয়ে কৃষক সংগ্রামে পার্টির নেতৃত্ব মারফত কার্যকরী হয় না, বাস্তবিক পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কার্যকরী হয় কাজের মধ্য দিয়ে, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কৃষক সমাজের দাবি দাওয়ার সুদৃঢ় সমর্থনের মধ্য দিয়ে এবং শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কৃষক সংগ্রামকে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে। কাজের ক্ষেত্রে এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সমাজের মৈত্রী কার্যকর করতে হবে, শুধু তত্ত্ব দিয়ে নয়। শ্রমিকশ্রেণী হলো কৃষকের সংগ্রামের বন্ধু সংগ্রামী কৃষককে শ্রমিকশ্রেণী নিশ্চয়ই সাহায্য করবে এবং উভয়ের যে শত্রু তার পরাজয় সুনিশ্চিত করবে।

"ক্ষেতমজুর ও গরিব চাষীর উপর নির্ভর করে, কৃষক সমাজের সংগে মৈত্রীর দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সমগ্র জনতার সহযোগিতায় শ্রমিকশ্রেণী শহর গ্রামাঞ্চলে মুক্তির সংগ্রামে, জমি ও রুটির লড়াইয়ে সকলের জন্য কাজ ও শান্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব করে।

১৪

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্ন

প্রলেতারীয় বিপ্লবের অন্যতম কাজ হলো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বলতে কি বুঝায় এবং কেনই বা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে ?

মার্কস বলেছিলেন ঃ "বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে।" ইতিহাসের পূর্বেকার বিপ্লবের মতন শুধু রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করেই শ্রমিকশ্রেণী তার লক্ষ্যে—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সেই আগেকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে চালনা করতে পারে না। প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা শ্রমিকশ্রেণীকে সেই শিক্ষাই দেয়।

১৮৭১ সালের প্যারি কমিউন ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রথম প্রচেষ্টা। যদিও সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি, তবু প্যারি কমিউন চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে। ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারি নগরীতে মেহনতী জনগণ নিজেদের শক্তির জোরে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে দখল করেছিল রাষ্ট্রক্ষমতা, স্থাপন করেছিল নিজেদের সরকার, ইতিহাসে এই প্রথম দেখা দিল শ্রমিকদের সরকার। বিত্তহীনদের সরকার। প্যারি নগরীতে তখন ঘোষিত হয়েছিল "কমিউন"—ইতিহাসে এই কমিউনই খ্যাতিলাভ করেছে "প্যারি কমিউন" নামে। যদিও এর আয়ু ছিল মাত্র ৭২ দিন (১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে) তবুও প্যারি কমিউন ধ্রুব তারার মতন সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে। সেদিন "কমিউন দীর্ঘজীবী হোক!" রণধ্বনির মধ্য দিয়ে ঘোষিত হয়েছিল এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থার আগমনী বার্তা।

এই নতুন সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন হলো রুশ দেশে ১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যে—ছেচল্লিশ বছর পরে প্যারি কমিউন আবার বেঁচে উঠলো রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লবের বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়ে।

প্যারি কমিউনই প্রথম দেখিয়ে দিল কিভাবে মেহনতী জনসাধারণকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করতে হয়। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনগণ যখন বিত্তবান শ্রেণীকে রাষ্ট্র তখ্‌ত থেকে উচ্ছেদ করবে তখন কি ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে, তারই একটি রূপ প্যারি কমিউন দেখিয়ে দিল।

এই প্যারি কমিউনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মার্কস তাঁর "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" গ্রন্থে লিখেছিলেনঃ "কমিউন ছিল মূলতঃ শ্রমিকশ্রেণীর নিজের গভর্নমেন্ট; অপরের শ্রমফল আত্মসাৎ করে যারা ভোগদখল করছে সেই শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর যে সংগ্রাম, এই কমিউন ছিল সেই সংগ্রামেরই অবদান বিশেষ। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিকের আর্থিক মুক্তি সম্ভব হতে পারে অবশেষে সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয় এবং কমিউন হলো সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা।"

এই গ্রন্থের শেষে মার্কস লিখেছিলেনঃ "কমিউন সমেত শ্রমিকশ্রেণীর প্যারিস চিরদিন এক নতুন সমাজের গৌরবদীপ্ত অগ্রদূত হিসাবে নন্দিত হবে।"

কমিউনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস লিখলেনঃ "কমিউন বিশেষভাবে একটি বিষয় প্রমাণ করেছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর আগের তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্র কেবল করায়ত্ত করেই তার নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে চালনা করতে পারে না।" (কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো, ১৮৭২ সালের ২৪শে জুনের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা।)

প্যারি কমিউনের এই মূল শিক্ষাকে মার্কস ও এঙ্গেলস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

বিবেচনা করেছিলেন। তাঁদের মতে শ্রমিকশ্রেণীকে শুধু "আগেকার তৈরী রাষ্ট্র-যন্ত্রকে দখল করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলে চলবে না, তাদের আরও কঠিন কর্তব্য পালনের জন্য অগ্রসর হতে হবে।" শ্রমিকশ্রেণীকে "আগেকার তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে" অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে হবে—এই কথাই মার্কস লিখেছিলেন কুগেলমানকে ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে, অর্থাৎ কমিউন যখন চলছিল তখন। মার্কস সে চিঠিতে কুগেলমানকে লিখেছিলেন ঃ

"আমার অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আপনি দেখতে পাবেন ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী প্রচেষ্টা কি হবে তা আমি সেখানে বলেছি ঃ পূর্বের ন্যায় আমলাতান্ত্রিক সামরিক যন্ত্রকে হস্তান্তরিত করার চেষ্টা আর হবে না, চেষ্টা হবে সে যন্ত্রকে ধ্বংস করার।"

এই চিঠিতে মার্কস বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করাই জনবিপ্লবের প্রথম শর্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে শ্রমিকশ্রেণী তার জায়গায় কি প্রতিষ্ঠিত করবে? এ প্রশ্নের জবাবও মার্কস-এঙ্গেলস দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সেই বক্তব্যকে বিকশিত করেছেন, বাস্তবে রূপায়িত করেছেন লেনিন।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে তার জায়গায় সংস্থাপিত করা হবে এক নতুন শাসকশ্রেণীর কর্তৃত্ব। শ্রমিকশ্রেণীই হবে সেই নতুন শাসকশ্রেণী অর্থাৎ তখন রাষ্ট্রক্ষমতা আসবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে এবং রাষ্ট্র বলতে শাসকশ্রেণী হিসাবে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীকেই বোঝাবে।

"কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো"তে মার্কস ও এঙ্গেলস এ সম্বন্ধে বলে-ছিলেন ঃ

"প্রলেতারিয়েতের বিকাশের সাধারণতম পর্যায়গুলির ছবি আঁকতে গিয়ে আমরা দেখিয়েছি যে, বর্তমান সমাজের ভিতরে কম-বেশি প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ চলেছে, যে যুদ্ধ একটা বিন্দুতে এসে প্রকাশ্য বিপ্লবে পরিণত হয় এবং তখন বুর্জোয়া-দের সবলে উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলেতারিয়েতের আধিপত্যের ভিত্তি।"

"কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো"র আর এক জায়গায় তাঁরা বলেছেন ঃ

"আগে আমরা দেখেছি যে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রথম ধাপ হলো প্রলে-তারিয়েতকে শাসকশ্রেণীর পদে উন্নীত করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা।

"বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেওয়ার জন্য, রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসকশ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং উৎপাদনী শক্তির মোট সমষ্টিটাকে যথা-সম্ভব দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে।

"শুরুতে অবশ্যই সম্পত্তির অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদক পরিস্থিতির উপর স্বৈরাচারী আক্রমণ ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না, সুতরাং তা করতে হবে এমন সব ব্যবস্থা মারফত যা অর্থনীতির দিক থেকে অপর্যাপ্ত ও অযৌক্তিক মনে হবে। কিন্তু যাত্রাপথে এরা নিজ সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং পুরোনো সমাজ-ব্যবস্থার উপর আরও আক্রমণ প্রয়োজনীয় করে তুলবে; উৎপাদন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপ্লবীকরণের উপায় হিসাবে যা অপরিহার্য।

"ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবশ্যই এই ব্যবস্থাগুলি হবে বিভিন্ন।"

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করে তার জায়গায় শ্রমিকশ্রেণী এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র সংস্থাপিত করবে। সেই রাষ্ট্রের সংজ্ঞার নির্দেশ করা হয়েছে, "কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টোর" উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্র বলতে তখন বুঝাবে শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতকে বা শ্রমিকশ্রেণীকে। তখন দেখা দেবে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র—প্রলেতারীয় রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র।

কিন্তু প্রলেতারীয় রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? এ রাষ্ট্রের মূল ধারণা কি? এ প্রশ্নেরও উত্তর মার্কস দিয়েছেন একটি কথার মধ্যে। সে কথাটি হলো: শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টোতে যদিও এই কথাটি ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু এই ধারণাই ব্যক্ত হয়েছে ম্যানিফেস্টোর উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে।

"কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো"র এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লেনিন তাঁর "রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের মতবাদ সম্পর্কিত নোট বইতে" যে মন্তব্য করেছেন, এই প্রসঙ্গে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেনিন মন্তব্য করে লিখলেন:

"কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"তে 'শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক বিপ্লবের' কথা, 'কমিউনিস্ট বিপ্লবের' কথা, 'প্রলেতারীয় বিপ্লবের' কথা বলা হয়েছে। 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব' কথাটির সাক্ষাৎ তখন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, শ্রমিকশ্রেণীর 'শাসকশ্রেণীতে রূপান্তর', শ্রমিকশ্রেণীর 'শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠন', 'সম্পত্তির অধিকারের উপর শ্রমিকশ্রেণীর স্বৈরাচারী আক্রমণ' ইত্যাদি—ইহাই তো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।...'রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী'—ইহাই তো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।" (রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের মতবাদ, "ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রাম" পরিশিষ্ট, লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট, লন্ডন)।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয় ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৮৫০ সালের এপ্রিল মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত তিনটি দেশের—জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংলন্ড—বিপ্লবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের বৈঠকে "বিপ্লবী কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান" গঠনের উদ্দেশ্যে যে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় তার প্রথম ধারায়

বলা হয় ঃ "মানব সমাজের শেষ রূপ হবে কমিউনিজম এবং সেই কমিউনিজমে না পেঁছানো পর্যন্ত বিপ্লবকে চিরস্থায়ী করে রেখে সুবিধাভোগকারী সকল শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা এবং এই সব শ্রেণীকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে দাবিয়ে রাখাই হলো এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।" (লেবর মান্থলী, আগস্ট ১৯২৮—টি এ জ্যাকসন রচিত "ডায়েলেকটিকস" গ্রন্থের ৪৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

এই প্রস্তাবে জার্মান কমিউনিস্ট লীগের পক্ষ থেকে উইলিচ, মার্কস এবং এঙ্গেলস, ফরাসী ব্ল্যাঙ্কিপন্থীদের পক্ষ থেকে অ্যাডাম এবং ভিদাল, আর ইংলিস চার্টিস্টদের পক্ষ থেকে জর্জ জালিয়ান হারনে স্বাক্ষর করেন। এই প্রস্তাবের রচয়িতা ছিলেন মার্কস এবং এখানেই তিনি প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্ব কথাটি ব্যবহার করেন।

পরে অবশ্য ১৮৫২ সালের ৫ই মার্চ তারিখে হেবডেমেয়ারের কাছে লেখা মার্কসের চিঠিতে এই কথাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই চিঠিতে মার্কস লিখলেন ঃ

"নিজের পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি, বর্তমান সমাজে শ্রেণী বা শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব আবিষ্কার করার কৃতিত্ব আমার নয়। আমার বহু পূর্বে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এই শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ ব্যাখ্যা করেছেন। নতুনের মধ্যে আমি শুধু নিম্নলিখিত বিষয় প্রমাণ করেছি ঃ (১) উৎ-পাদনের বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গেই কেবল শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব জড়িত, (২) শ্রেণীসংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্ব, (৩) যে অবস্থায় শ্রেণীসমূহের বিলোপ ঘটবে এবং শ্রেণীহীন সমাজের পত্তন হবে, শ্রমিকশ্রেণীর এই একনায়কত্ব হচ্ছে সেই অবস্থায় উত্তরণের পথ মাত্র।"

উল্লিখিত ১৮৫০-এর এপ্রিল প্রস্তাব ও ১৮৫২-এর মার্চের চিঠি থেকে বোঝা যায় যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কথাটি মার্কস "ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রাম" পুস্তকের আগে, প্যারি কমিউনের আগে, "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের আগে, এমন কি "অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার" গ্রন্থেরও আগে ব্যবহার করেছিলেন। আসলে বিপ্লবী পরিস্থিতির মধ্য থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্লোগানের উদ্ভব। এই কথাটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় মার্কসের "ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম, ১৮৪৮-৫০" গ্রন্থে। মার্কস যেভাবে লিখেছেন, তাতে এই স্লোগানটি চয়ন করবার সমস্ত কৃতিত্ব ১৮৪৮-এর জুন দিনগুলির প্যারিসের বীর প্রলেতারিয়েতদের। মার্কসের কথায় ঃ "বিপ্লবী সংগ্রামের সাহসী স্লোগান দেখা দিল।

"বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ কর! শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব!"

কিন্তু মার্কসের এই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের চেহারাটা কি রকম? এ

প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন এঙ্গেলস। মার্কসের "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" পুস্তকের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় ১৮৯১ সালে এঙ্গেলস লিখলেন ঃ

"সম্প্রতি সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক অর্বাচীনেরা 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব' কথাটিতে আর একবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। বেশ ভাল কথা। ভদ্রমহোদয়-গণ, এই একনায়কত্ব—দেখতে কেমন তা কি আপনারা জানতে চান? প্যারি কমিউনের দিকে তাকিয়ে দেখুন—ওটাই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।"

প্যারি কমিউন ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য শ্রমিক বিপ্লবের প্রথম প্রচেষ্টা। কমিউন হচ্ছে অবশেষে আবিষ্কৃত সেই রাষ্ট্ররূপ যা ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান গ্রহণ করবে। মার্কস তাঁর "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" পুস্তকে কমিউ-নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লিখলেন ঃ

"কমিউনের অসংখ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্বার্থ নিজের নিজের অনুকূলে কমিউনের ব্যাখ্যা করেছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে কমিউন ছিল একটি পুরোপুরি প্রসারক্ষম রাষ্ট্ররূপ, অথচ গভর্নমেণ্টের পূর্ববর্তী সমস্ত রূপই ছিল নিঃসংশয়ে নিপীড়নমূলক। এর যথার্থ রহস্য হচ্ছে ঃ "কমিউন ছিল মূলত শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব গভর্নমেণ্ট; অপরের শ্রমফল আত্মসাৎ করে যারা ভোগদখল করছে সেই শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর যে সংগ্রাম এই কমিউন ছিল সেই সংগ্রামেরই অবদান বিশেষ। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিকের আর্থিক মুক্তি সম্ভব হতে পারে অবশেষে সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়, এবং কমিউন হলো সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা।"

১৫

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বৈশিষ্ট্য

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করে শ্রমিকশ্রেণী কি রকম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে তা প্যারি কমিউনে আবিষ্কৃত হলো সত্য, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, কমিউন সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব ছিল না, কমিউন ছিল গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। ফরাসীদেশের তৎকালীন (১৮৭০-৭১) অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। কেননা "ফরাসী ধনতন্ত্র তখনো খুব সামান্যই বিকশিত হয়েছিল এবং সে সময়ে ফ্রান্স প্রধানত ছিল পেটিবুর্জোয়াদের (কারিগর, কৃষক, দোকানদার প্রভৃতির) দেশ। অন্যদিকে শ্রমিকদের কোনো পার্টিও তখন ছিল না, শ্রমিকশ্রেণী তখন ছিল নিতান্তই অপ্রস্তুত এবং তাদের

কোন ট্রেনিং ছিল না ; এমন কি নিজেদের করণীয় কাজ সম্পর্কে এবং সে কাজগুলি সুসম্পন্ন করার পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। প্রলেতারিয়েতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না, ছিল না কোনো শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় সমিতি।" (লেনিন—১৯১১ সালের ২৮শে এপ্রিলের রাবোচাইয়া গাজেতা পত্রিকায় প্রকাশিত "প্যারি কমিউন স্মরণে" প্রবন্ধ)।

কমিউনের শিক্ষা বিবৃত করতে গিয়ে লেনিন "প্যারি কমিউন ও গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের করণীয় কাজ" শীর্ষক প্রবন্ধের (এই প্রবন্ধটি "প্রলেতারী" পত্রিকার অষ্টম সংখ্যায়—১৯০৫, ১৭ই জুলাই প্রকাশিত হয় ; এই প্রবন্ধের লেখক কে ছিলেন তা জানা যায়নি। এই প্রবন্ধটির উপসংহার লেনিন লিখেছিলেন) উপসংহারে লিখলেন ঃ

"ইহা (কমিউন—লেখক) আমাদের সর্বপ্রথমে এই শিক্ষাই দেয় যে, কোনো একটি বিপ্লবী সরকারে পেটিবুর্জোয়াদের একসংগে সোস্যালিস্ট প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নীতির দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য এবং কোনো কোনো পরিস্থিতিতে এরকম অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। ইহা আমাদের আরও দেখিয়ে দিচ্ছে যে, কমিউনকে যে ব্যবহারিক কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছিল সেটা ছিল সর্বোপরি গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা—সোস্যালিস্ট একনায়কত্ব স্থাপন করা তার কাজ ছিল না, আমাদের 'ন্যূনতম কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করাই ছিল তার কাজ।" (লেনিন কালেকটেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৯, পৃঃ ১৪১)।

কমিউন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে বলশেভিক পার্টি কি শ্লোগান গ্রহণ করবে সে সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে লেনিন আরও লিখলেন ঃ

"আমাদের যা করতে হবে তা হলো ঃ তাদের (কমিউনিস্টদের—লেখক) কর্মসূচী ও কর্মধারা সম্পর্কিত তাদের শ্লোগানের মধ্য থেকে সাবধানে আমাদের সেই শ্লোগানই বেছে নিতে হবে যা রাশিয়ার বর্তমান অবস্থার সংগে খাপ খায়। সেই শ্লোগানের মর্মকথা হচ্ছে ঃ 'শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব" (ঐ)।

কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে রাশিয়ার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে বলশেভিক পার্টির ন্যূনতম কর্মসূচীকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে লেনিন পার্টির সামনে যে শ্লোগান রেখেছিলেন তা হচ্ছে ঃ "শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।"

লেনিন সেদিন একথাই ঘোষণা করেছিলেন যে, রুশদেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়ের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হবে

সে সরকার হবে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, আর তারপরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হবে সে সরকার হবে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব ; এককথায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। রুশদেশে ১৯০৫ সালে যে বিপ্লব ঘটেছিল সে বিপ্লব ছিল গণ-তান্ত্রিক বিপ্লব—বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। সে বিপ্লব বিজয়ী হতে পারেনি। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে যে বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন ঘটলো সে বিপ্লবও ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কিন্তু সে বিপ্লবে রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়া আর তার অনুচরেরাই দখল করলো। সেই বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্ত-রিত করে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সফল করলো নভেম্বর বিপ্লব—রুশদেশে প্রতিষ্ঠিত করলো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। এ বিপ্লব ছিল সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব।

মার্কস ও এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্বন্ধে তাঁদের শিক্ষাকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁরা তখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী চিন্তাধারায়। অবশ্যম্ভাবী চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের গৃহযুদ্ধের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যেই পার্লামেন্টারী ব্যবস্থাকে ও সর্বজনীন ভোটাধিকারকে ব্যবহার করার শিক্ষা মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীকে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখলের মতবাদ, ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের" মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। তাঁরা বিসর্জন দিলেন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মত-বাদকে। এঁদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের বিপ্লবী মার্কসীয় শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে তিনি দেখালেন যে, ধনতন্ত্রে রাষ্ট্র হচ্ছে ধনিক-শ্রেণীর একনায়কত্বেরই হাতিয়ার এবং এর একমাত্র বিকল্প হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।

লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে—যে যুগটা হচ্ছে আবার প্রলেতারীয় বিপ্লবের পূর্বাহ্ন, সে যুগে কোনো দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে হলে সে-বিপ্লবের নেতৃত্ব শ্রমিক-শ্রেণীকেই গ্রহণ করতে হবে কেননা বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে অসমাপ্ত রেখে মাঝপথে আপস করতে চায়। শ্রমিকশ্রেণীকেই এই বিপ্লব সমাপ্ত করতে হবে এবং তার জন্য প্রধান মিত্র হিসাবে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়কেই সমাবেশ করতে হবে, আর রাষ্ট্রক্ষমতা আনতে হবে শ্রমিক কৃষকের হাতে, রাষ্ট্রক্ষমতায় কিছুতেই বুর্জোয়াদের অধিষ্ঠিত হতে দেওয়া হবে না। লেনিন সেই ক্ষমতার

সংজ্ঞা দিলেন ঃ "শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।" সঙ্গে সঙ্গে লেনিন এ কথাও ঘোষণা করলেন যে, শ্রমিকশ্রেণী মাঝপথে থেমে থাকবে না, গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে তারা অবিলম্বে এবং শ্রেণীসচেতন ও সুসংহত প্রলেতারিয়েতের শক্তি অনুপাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করবে। সেই বিপ্লবের ফলে তারা যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে তার সংজ্ঞা হলো ঃ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। অর্থাৎ "শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান হলো ঃ শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, আর প্রলেতারীয় বিপ্লবের স্লোগান হলো ঃ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।"

সমস্ত বিপ্লবেরই মূল প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্ন। প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের মূল কথা হলো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করেই স্থাপিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। প্রলেতারীয় বিপ্লব শোষকশ্রেণীর মূল স্বার্থের উপরই আঘাত হানে, রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে তাদের অপসারিত করে। তাই শ্রমিকশ্রেণী যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, যখন তারা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ করে দেয়, তখন ক্ষমতাচ্যুত শোষকশ্রেণীর কাছ থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধ আসে। সেই প্রতিরোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্যই প্রয়োজন হয় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের। এর প্রয়োজন হয়—

—"বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য ;

—"প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে সন্ত্রাস সঞ্চয়ের জন্য ;

—"বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ;

—"শ্রমিকশ্রেণী যাতে তার শত্রুদের সবলে দাবিয়ে রাখতে পারে তার জন্য।"

(লেনিন ঃ প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউৎস্কি)

তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে, প্রলেতারীয় বিপ্লব সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায় না, সেগুলি সমাজে বিরাজ করতে থাকে এবং তাদের অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থাও বেশ কিছুকাল বজায় থাকে এবং সর্বদাই পুরানো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপদ থেকে যায়। সুতরাং ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটে না— পরিবৃত্তিকালেও, অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত শ্রেণী সংগ্রাম চলতে থাকে। তবে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয় নতুন পরিবেশে এবং এ সংগ্রাম নতুন রূপও ধারণ করে। এই নতুন জিনিস হলো যে শ্রমিকশ্রেণী এখন "শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত।" আর যারা এতদিন শাসকশ্রেণী ছিল সেই বুর্জোয়ারা পরাজিত হয়েও তাদের প্রতিরোধ বন্ধ করে না, বরং প্রতিরোধকে আরও সুতীব্র করে তোলে। এই পরাজিত বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই তখন চলে

শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রাম। তাই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব শ্রেণীসংগ্রামের শেষ নয়, এ হলো নবরূপে শ্রেণীসংগ্রামের পুনরাবৃত্তি।

লেনিনের কথায়ঃ

"শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হলো অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে নতুন শ্রেণীর সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সবচেয়ে কঠোর সংগ্রাম। ক্ষমতাচ্যুত (একদেশে হলেও) হওয়ায় এদের প্রতিরোধ দশগুণ বেড়েছে। এদের শক্তি শুধু আন্তর্জাতিক পুঁজির জোরে নয়, শুধু বুর্জোয়াশ্রেণী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জোর আর স্থায়িত্বে নয়, সে শক্তি অভ্যাসের টান ও খুদে উৎপাদনের শক্তিতেও। কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে ছোটখাটো উৎপাদন প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপকভাবে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে। এই সব কারণেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রয়োজন। দীর্ঘকাল অত্যন্ত কঠোর বেপরোয়া জীবন-মরণ সংগ্রাম চালিয়ে তবেই বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর জয়লাভ সম্ভব। সে লড়াইয়ে চাই শৃংখলা, চাই দৃঢ়তা, অদম্যতা আর চিন্তার ঐক্য।" (বামপন্থী কমিউনিজম ঃ শিশুসুলভ বিশৃংখলা)

ঐ গ্রন্থেই লেনিন আরও বলেছেন ঃ

"শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব পুরানো সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, কখনো তা রক্তক্ষয়ী, কখনো রক্তপাতহীন, কখনো সহিংস, কখনো শান্তিপূর্ণ, কখনো সামরিক এবং অর্থনৈতিক, কখনো শিক্ষামূলক এবং শাসনতান্ত্রিক।

"শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে এক নতুন ধরনের গণতন্ত্র—জনগণের গণতন্ত্র, সমাজের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র। এই প্রথম ব্যাপক জনসাধারণকে প্রশাসনিক কাজের মধ্যে টেনে আনা হয়। এ গণতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে লাখো লাখো গুণ বেশি গণতান্ত্রিক। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত হয় শ্রমিকশ্রেণীর জন্য, মেহনতী জনগণের জন্য গণতন্ত্র। অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য গণতন্ত্রের নিরাকরণ। অর্থাৎ শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় একনায়কত্ব আর মেহনতী জনগণের জন্য প্রয়োগ করা হয় গণতন্ত্র। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ধনী-গরিব নির্বিশেষে, সকলের জন্য "পূর্ণ" গণতন্ত্র হতে পারে না; শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে হতে হবে "শ্রমিকশ্রেণীর জন্য, সম্পত্তিহীন জনসাধারণের জন্য নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে নতুন ধরনের একনায়কত্ব।" (লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪)।

অন্যান্য শ্রেণীগুলির একনায়কত্ব আর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে রয়েছে এক মূলগত পার্থক্য। মধ্যযুগের জমিদারদের একনায়কত্ব ও পুঁজিবাদী

যুগের বুর্জোয়া একনায়কত্বের সারকথা হলো সমাজের প্রচুরতম মানুষকে অর্থাৎ মেহনতী জনগণকে শোষণ করার ব্যবস্থা দৃঢ় করা এবং শোষণ ও নির্যাতনে জর্জরিত মেহনতী জনগণের প্রতিরোধকে সবলে দমন করা। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সারকথা হলো মেহনতী জনগণের অর্থাৎ সমাজের প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধনের ব্যবস্থা করা এবং শোষকদের অর্থাৎ জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের—জমিদার ও পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ সবলে দমন করা।

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের ফলেই বিপ্লবের মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কেননা বুর্জোয়ারা কখনোই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। আবার শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরও বুর্জোয়ারা প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের উচ্ছেদের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। তাই বুর্জোয়াদের প্রতিরোধকে সবলে দাবিয়ে দেবার, তাদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করবার জন্য প্রয়োজন হয় বলপ্রয়োগের। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বেও চলতে থাকে শ্রেণীসংগ্রাম। সেজন্য শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামেরই যুক্তিসংগত অনুবৃত্তি। কিন্তু যেহেতু বিপ্লবের বিজয়ের পর, শাসনক্ষমতা দখলের পর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এই শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালিত হয় সেহেতু শ্রেণীসংগ্রামের রূপটাও পাল্টায়। বিপ্লবের পূর্বে যে শ্রেণীসংগ্রাম ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে, শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সেই শ্রেণীসংগ্রাম বিপ্লবের পর নতুন পরিস্থিতিতে নতুন রূপ ধারণ করে—শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এই সংগ্রাম পরিচালনা করে; এই সংগ্রাম পরিচালিত হয় উৎপাদনের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ও নতুন সমাজ গড়ে তোলার পথে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে সমস্ত প্রতিরোধকে সবলে দাবিয়ে দেবার জন্য। এই সংগ্রাম পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব যত বেশি সাফল্য অর্জন করবে ততই এই একনায়কত্ব শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অবসানের, সর্বরকম শ্রেণীবৈষম্য ঘুচিয়ে দেবার দিকেই অগ্রসর হবে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব তার নিজের অবলুপ্তির দিকেই অগ্রসর হবে। যার থেকে প্রতিরোধের উৎপত্তি সেই শ্রেণীর ভিত্তিই যখন থাকবে না, তখন কোনোরকম একনায়কত্বের প্রশ্নও থাকবে না। রাষ্ট্র তখন অন্তর্হিত হয়ে যাবে বা শুকিয়ে যাবে।

১৬
কতকাল চলবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব

প্রলেতারীয় বিপ্লবের পর কতকাল ধরে চলবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব? মার্কস ও লেনিন উভয়ের মতেই উচ্চতর পর্যায়ে কমিউনিস্ট সমাজের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত স্তরটি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের তথা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগ।

ধনতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ ধরেই অর্থাৎ সমস্ত শ্রেণী পার্থক্যের অবসান ঘটিয়ে শ্রেণীহীন সমাজে তথা কমিউনিস্ট সমাজে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অপরিহার্য। এই হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা। কিন্তু এই শিক্ষাকে ভলগার জলে বিসর্জন দিয়েছেন ক্রুশ্চেভপন্থী নয়া-তত্ত্ববাগীশেরা। শ্রমিকশ্রেণীর জায়গায় তারা খাড়া করেছেন: "সমগ্র জনসাধারণের রাষ্ট্র" বা "জনরাষ্ট্রের" থিওরী।

১৯৬১ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে যে কর্মসূচী গৃহীত হলো তাতে ঘোষণা করা হলো:

"কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় সমাজতন্ত্রের পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয় সাধনের পর এবং পূর্ণাঙ্গ কমিউনিজম গঠনের দিকে সমাজের উত্তরণের পর শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পূরণ করা গিয়েছে এবং তা অভ্যন্তরীণ বিকাশের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে আর অপরিহার্য নয়। শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্ররূপে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, তা নতুন সমসাময়িক পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের স্বার্থ ও কামনাকে অভিব্যক্ত করার প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমগ্র জনসাধারণের রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে।...পার্টি মনে করে যে, রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটার পূর্বে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কমিউ-নিজমের চূড়ান্ত বিজয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র সমগ্র জনসাধারণের এক সংগঠনরূপে টিকে থাকবে"। (কর্মসূচী, পৃঃ ৯৬, সোভিয়েত দেশ প্রকাশনার সংস্করণ)।

এই কর্মসূচীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন:—

"আজ পর্যন্ত সব সময়ে রাষ্ট্র ছিল কোনো একটি শ্রেণীর একনায়কত্বের হাতিয়ার। ইতিহাসে এই প্রথম আমাদের দেশে রাষ্ট্র এমন একটি রূপ পরিগ্রহ করেছে যা কোনো একটি শ্রেণীর একনায়কত্ব নয়, যা সমগ্রভাবে সমাজের, সমগ্র জনসাধারণের হাতিয়ার। কমিউনিস্ট নির্মাণকার্যের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের আর প্রয়োজন নেই।" (ক্রুশ্চেভের ভাষণ, পৃঃ ৮১ সোভিয়েত

দেশ প্রকাশনার সংস্করণ)। অর্থাৎ এই সব নয়া-তত্ত্ববাগীশের মতে সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন শুরু হয়েছে "জনরাষ্ট্রের" যুগ। কমিউনিস্ট সমাজ গঠিত হবার পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভ আর তার অনুচরদের থিওরী অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অবসান ঘটেছে।

অথচ "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনায়" মার্কস বলেছিলেন ঃ

"ধনতান্ত্রিক সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজের মাঝখানে রয়েছে প্রথমটির দ্বিতীয়টিতে রূপান্তরের একটা যুগ বা কাল। এই যুগের বা কালের উপযোগী একটি রাজনৈতিক পরিবর্ত্তিকালও আছে যেখানে রাষ্ট্র প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

এই পরিবর্ত্তিকাল হচ্ছে সমাজতন্ত্র গড়ার যুগ। সাধারণভাবে যাকে সমাজতন্ত্র বলা হয়ে থাকে তাকেই মার্কস অভিহিত করেছিলেন কমিউনিজমের নিম্ন পর্যায় বলে। এই নিম্ন পর্যায়েই বিরাজ করতে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। কমিউনিজমের এই নিম্ন পর্যায় যখন উচ্চ-পর্যায়ে অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজে উন্নীত হবে তখন রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। এই পরিবর্ত্তিকালেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া; সুদৃঢ় হওয়া এবং অন্তর্হিত হওয়ার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিকাশ ও বিলুপ্তি ঘটে।

অন্যদিকে লেনিন তার "রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের মতবাদ" নোট বইতে লিখেছিলেন ঃ

"শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে একটি রাজনৈতিক পরিবর্ত্তিকাল। একথা সুস্পষ্ট যে এই কালের রাষ্ট্রও হচ্ছে পরিবর্ত্তিকালের একটি রূপ—রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রহীন অবস্থায় উত্তরণের রূপ।"

আরও পরিষ্কার করে লেনিন তাঁর ঐ নোট বইতে লিখলেন ঃ

"(১) **ধনতন্ত্রী সমাজে** যে রাষ্ট্র তা প্রকৃত অর্থেই রাষ্ট্র—এই রাষ্ট্র বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন।

"(২) **পরিবর্ত্তিকাল**—এখানে রাষ্ট্র (শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব) হচ্ছে পরিবর্ত্তিকালীন রাষ্ট্র (রাষ্ট্র কথাটির প্রকৃত অর্থে ইহা রাষ্ট্র নয়)—এই রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন।

"(৩) **কমিউনিস্ট সমাজ**—রাষ্ট্র এখানে বিলুপ্ত হয়ে যায়—রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন থাকে না, রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যায়।" (লরেন্স উইশার্ট কর্তৃক প্রকাশিত মার্কসের "ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রামের" পুস্তকের পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭৩)।

লেনিনের এই বক্তব্যের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির

ক্রুশ্চেভপন্থী নেতাদের "জনরাষ্ট্রের" স্থান নেই, আর লেনিন পরিবৃত্তিকালে অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার আগের স্তরে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব যে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা সে কথাই ঘোষণা করেছেন।

ক্রুশ্চেভপন্থীরা মার্কস ও লেনিনের এই শিক্ষাকে বরবাদ করে দিয়ে মার্কসবাদকে সংশোধন করেছেন।

আর "জনরাষ্ট্র"? কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে কোথাও কি "জনরাষ্ট্রের" কথা আছে? হ্যাঁ, আছে। ১৮৭৫ সালের ১৮ থেকে ২৮শে মার্চের মধ্যে জার্মান শ্রমিকনেতা বেবেলের কাছে এঙ্গেলস যে সব চিঠি লিখেছিলেন তাতে এই "জনরাষ্ট্রের" কথা আছে। বেবেল তাঁর "আমাদের লক্ষ্য" নামক পুস্তিকায় লিখেছিলেন: 'শ্রেণীগত আধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে জনরাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে হবে।" বেবেলের এই ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করে দিয়েছিলেন এঙ্গেলস বেবেলের কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে। এঙ্গেলস লিখেছিলেন:

"যেহেতু রাষ্ট্র একটা অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতিপক্ষকে দাবিয়ে রাখার জন্য, সংগ্রামে ও বিপ্লবে যার ব্যবহার সেহেতু স্বাধীন জনরাষ্ট্রের কথা বলা একান্ত অর্থহীন। প্রলেতারিয়েতের কাছে রাষ্ট্রের যতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজন, ততক্ষণ সেটা প্রয়োজন স্বাধীনতার স্বার্থে নয়, প্রয়োজন প্রতিপক্ষকে দাবিয়ে রাখার জন্য এবং স্বাধীনতার কথা যখন বলা সম্ভব হয় তখন রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না।"

এঙ্গেলস এই চিঠিতে আরও লিখেছিলেন: "নৈরাজ্যবাদীরা বহুদিন যাবৎ 'জনরাষ্ট্র' কথাটি আমাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারছে।"

এঙ্গেলসের সমালোচনার সঙ্গে বেবেল যে "সম্পূর্ণ একমত" তা তিনি পরিষ্কারভাবে এঙ্গেলসকে জানিয়েছিলেন ১৮৭৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে।

এ সম্পর্কে লেনিন তাঁর "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থে লিখেছেন: 'জনরাষ্ট্র' এই কথাটিকে নৈরাজ্যবাদীরা আমাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারে—এ কথা বলবার সময় এঙ্গেলসের মনে হয়েছিল বিশেষভাবে বাকুনিন ও জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটদের উপর তাঁর আক্রমণের কথা।

"স্বাধীন জনরাষ্ট্রের ন্যায় জনরাষ্ট্র যেমন ' অর্থহীন ও সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্যুত, এঙ্গেলস স্বীকার করেন যে, জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটদের উপর বাকুনিনের আক্রমণও তেমন ন্যায়সঙ্গত।"

এঙ্গেলসের কথায় যে 'জনরাষ্ট্র' কথাটি 'অর্থহীন ও সমাজতন্ত্র থেকে

বিচ্যুত' সেই 'জনরাষ্ট্র' কথাটিই সমাজতন্ত্রে আবার আমদানী করেছেন রুশ-দেশের আধুনিক সংশোধনবাদীরা, ক্রুশ্চেভপন্থীরা।

'জনরাষ্ট্র' বা 'সমগ্র জনসাধারণের রাষ্ট্র' এই স্লোগান তো প্রতিক্রিয়াশীল এই শ্রেণীগুলিরই অতি পুরাতন কৌশল। এ কৌশল তারা ব্যবহার করে নিজেদের একনায়কত্বকে মনোমুগ্ধকর কথা দিয়ে ঢেকে রাখবার জন্য এবং মেহনতী জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার জন্য। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যাবে যে, নিজেদের একনায়কত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রকেই বুর্জোয়াশ্রেণী বারবার অভিহিত করেছে 'সমগ্র জনসাধারণের রাষ্ট্র' বলে। বুর্জোয়াশ্রেণীর এই জালিয়াতির স্বরূপ অনেক আগেই উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন। রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্র সর্বকালেই শ্রেণীর একনায়কত্বের হাতিয়ার। 'শ্রেণীর ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র' বা 'সমগ্র জনসাধারণের রাষ্ট্র'—এ রকম কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই এবং অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

প্রলেতারীয় বিপ্লবের করণীয় কাজ 'জনরাষ্ট্রের' সংস্থাপনা নয়। প্রলেতারীয় বিপ্লবের কাজ হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বকে চূর্ণবিচূর্ণ করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। আর এই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ যখন গিয়ে পৌঁছাবে কমিউনিস্ট সমাজে যেখানে শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব থাকবে না, অর্থাৎ যখন প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন সমাজ তখনই শুধু রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

লেনিন তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে খুব পরিষ্কারভাবেই বলেছেন ঃ

"রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের শিক্ষার সারমর্ম শুধু তাঁরাই আয়ত্ত করতে পারেন যাঁরা উপলব্ধি করেন যে, একটিমাত্র শ্রেণীর একনায়কত্ব কেবল সাধারণভাবে প্রত্যেক শ্রেণীসমাজের জন্যই শুধু নয়, কিংবা বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদকারী শ্রমিকশ্রেণীর জন্যই শুধু নয়, পরন্তু ধনতন্ত্র ও শ্রেণীহীন সমাজের অর্থাৎ কমিউনিজমের মধ্যবর্তী সমগ্র ঐতিহাসিক যুগের জন্যও একটিমাত্র শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রয়োজন।"

সে একনায়কত্ব যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব তা তো স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু কতকাল ধরে চলবে এই ঐতিহাসিক যুগ? প্রত্যেকটি মার্কসবাদীর এ কথা মনে রাখা দরকার যে, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা এক বা দুই বা তিন চার দশকের কাজ নয়, এ হচ্ছে এক বিরাট দীর্ঘকালের কাজ।

এই ঐতিহাসিক যুগের কোনো টাইমটেবল দেওয়া যায় না, যাঁরা টাইম-টেবল দেবার চেষ্টা করেন তাঁরা অজ্ঞতার অন্ধকারেই বাস করেন।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের নীতির স্বীকৃতি হচ্ছে প্রকৃত বিপ্লবী মতাদর্শের

নির্ণায়ক। এটা কেনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে, আজকের দিনের সংশোধনবাদীরা সকলেই বিভিন্ন কায়দায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরোধিতা করার জন্য এগিয়ে এসেছে, এর পাল্টা সংগঠন হিসাবে তারা বুর্জোয়া 'সর্বজনীন গণতন্ত্রের' ধুয়ো তুলেছে।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আর সংশোধনবাদের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্যের মূল কথাও হলো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। যে ব্যক্তি শুধু শ্রেণীসংগ্রামকে স্বীকার করেই থেমে যায় সে ব্যক্তি এখনো মার্কসবাদী হতে পারেনি। 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে লেনিন তাই লিখেছিলেন ঃ

"অনেক সময়ে এইরূপ বলা ও লেখা হয়ে থাকে যে, মার্কসের তত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম, কিন্তু তা সত্য নয়। এই ভুল থেকেই নানা ক্ষেত্রে মার্কসবাদের সুবিধাসুলভ বিকৃতি দেখা দেয়, বুর্জোয়াদের নিকট গ্রহণযোগ্য করবার জন্য মার্কসবাদের মিথ্যা রূপ দেওয়া হয়। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব মার্কস উদ্ভাবন করেননি, মার্কসের পূর্বে বুর্জোয়ারা-ই এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছে এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে এই তত্ত্ব বুর্জোয়াদের নিকট গ্রহণযোগ্য। যে শুধু শ্রেণীসংগ্রামই স্বীকার করে সে যথার্থ মার্কসবাদী হয়ে উঠতে পারেনি, বুর্জোয়াসুলভ যুক্তি ও রাজনৈতিক গণ্ডি সে অতিক্রম করতে পারেনি। শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদের মধ্যে মার্কসবাদকে সীমাবদ্ধ করে রাখার অর্থ হচ্ছে মার্কসবাদের অঙ্গচ্ছেদ করা, মার্কসবাদকে বিকৃত করা, বুর্জোয়াদের গ্রহণযোগ্য একটা কিছুতে মার্কসবাদকে পর্যবসিত করা। সেই ব্যক্তিই মার্কসবাদী যে শ্রেণীসংগ্রামের স্বীকৃতি থেকে আরও অগ্রসর হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে। একজন মার্কসবাদী ও একজন সাধারণ খুদে কিংবা বড় বুর্জোয়ার মধ্যে গভীর পার্থক্য এখানেই। মার্কসবাদকে যথার্থ উপলব্ধি ও স্বীকার কেউ করতে পেরেছে কিনা তা এই কষ্টিপাথরেই যাচাই করতে হবে। ইহা আশ্চর্য নয় যে, ইওরোপের ইতিহাস যখন শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখে 'এই প্রশ্ন ব্যবহারিক আকারে উপস্থাপিত করলো তখন সুবিধাবাদী ও সংস্কারপন্থীরা শুধু নয়, পরন্তু কাউৎস্কিপন্থীরাও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে অস্বীকার করে হতভাগ্য কূপমণ্ডুক ও খুদে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করলো।"

১৯১৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে অর্থাৎ নভেম্বর বিপ্লবের কিছুকাল পূর্বে লেনিন রাষ্ট্র ও বিপ্লব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তারপরে অনেক ঘটনা ঘটেছে—যে নভেম্বর বিপ্লবের ফলে রুশদেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো সেই নভেম্বর বিপ্লবের কামান গর্জনের মধ্য দিয়ে বহু দেশের বিপ্লবীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখলো, শিখলো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশে এবং পূর্ব ইওরোপের কয়েকটি দেশে ও

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারপ্রান্তে একটি দেশে প্রতিষ্ঠিত হলো সমাজতন্ত্র, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।

এতো ঘটনার পরও আজ আবার ধনতান্ত্রিক ইওরোপের কোনো কোনো দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কিছু নেতা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বকে বিসর্জন দিয়ে হতভাগ্য কূপমণ্ডুক ও খুদে বুর্জোয়াগণতন্ত্রী রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শ্রমিকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দেয় যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাদের প্রথমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে এবং সেখান থেকে তাদের অগ্রসর হতে হবে কমিউনিস্ট সমাজের দিকে। শ্রমিকশ্রেণীকে মনে রাখতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের যুগ হলো এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক যুগ। এই সমাজে শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণীসংগ্রাম বিরাজ করতে থাকে। ধনতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবকে প্রতিহত করতে হবে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে এবং কমিউনিজমে উত্তরণের জন্য অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে—এ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক যুগে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত রেখেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একেবারে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে সমাপ্ত করতে হবে।

এই হলো কমিউনিজমে উত্তরণের পথ। এই পথেই লুপ্ত হবে শ্রেণী-বিরোধ, শ্রেণী-আধিপত্য, শ্রেণীর অস্তিত্ব, এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। "রাষ্ট্র তখন শুকিয়ে যাবে", প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন সমাজ যেখানে "কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো"র ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী "প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশই হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্তস্বরূপ।"

সংক্ষেপে তাই বলা যেতে পারে যে,—

(১) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে একটা রাজনৈতিক পরিবৃত্তিকাল ;

(২) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে পরিবৃত্তিকালীন ধরনের রাষ্ট্র—রাষ্ট্র কথাটির প্রকৃত অর্থে এটি রাষ্ট্র নয় ;

(৩) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে সমস্ত শ্রেণীর বিলুপ্তির স্তরে, শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণের পর্যায় ,

(৪) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অন্তর্হিত হয়ে যায় বা শুকিয়ে যায় শ্রেণী-হীন সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, তার আগে নয়।

এই হচ্ছে মার্কস-এঙ্গেলস লেনিনের শিক্ষা। তাই যারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে অস্বীকার করে আসলে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকেই অস্বীকার করে।

১৭

বিপ্লব কেন? কেন বলপ্রয়োগ?

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিকে, কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হবার অপরিহার্য পদক্ষেপ হলো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করা এবং সে কাজ শাসকশ্রেণী-রূপে সংগঠিত বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টোতে "শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক বিপ্লবের কথা" "প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের কথা" বলা হয়েছে। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীকে যে পথে অগ্রসর হতে হবে তারই নিশানা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তখন স্লোগান হিসাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করার কথা, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার কথা ওঠেনি।

পরবর্তীকালে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে ফ্রান্স, জার্মানীর ১৮৪৮-৫১-এর বিপ্লবের অধ্যায়ের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে মার্কস পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্র অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করার প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের পথ নির্দেশ করলেন। ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে অর্থাৎ প্যারি কমিউন যখন চলছিল তখন মার্কস তাঁর বন্ধু কুগেলমানের কাছে এক চিঠিতে লেখেন:

> "আমার 'অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তুমি দেখতে পাবে যে, ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী প্রচেষ্টা কী হবে তা আমি সেখানে বলেছি: পূর্বের ন্যায় আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্রকে হস্তান্তরিত করার চেষ্টা আর হবে না, চেষ্টা হবে সে যন্ত্রকে ধ্বংস করার"।

এই চিঠিতে মার্কস বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন এবং এই যন্ত্রকে ধ্বংস করাই জনবিপ্লবের বা জনগণের বিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

মার্কসের ঐ বক্তব্য সম্পর্কে লেনিন তাঁর "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থে লিখেছিলেন: "আমলাতান্ত্রিক—সামরিক যন্ত্র ধ্বংস করা—বিপ্লবের সময় রাষ্ট্রসম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর কি কর্তব্য সে-বিষয়ে মার্কসবাদের মৌল শিক্ষা এই কয়েকটি কথার মধ্যে সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে।"

কুগেলমানের কাছে লেখা মার্কসের এই চিঠিখানার উপর লেনিন বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই ১৯০৭ সালে "কুগেলমানের কাছে মার্কসের পত্রাবলী"র রুশ সংস্করণের ভূমিকায় লেনিন লিখলেন যে "১২ই এপ্রিলের চিঠিখানা হচ্ছে এমন একখানা চিঠি যা প্রত্যেকটি রুশ-সোস্যাল ডেমোক্রাট ও

অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেকটি রুশ শ্রমিকের ঘরে টাঙানো দেখলে আমরা আনন্দিত হবো।" অর্থাৎ এই চিঠিখানাকে সদাসর্বদা চোখের সামনে রেখে এর মূল কথাকে অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার সংকল্পে অটল থাকার নির্দেশই লেনিন দিয়েছিলেন বলশেভিক পার্টির প্রত্যেকটি কর্মীকে, রুশ দেশের প্রতিটি সাক্ষর শ্রমিককে।

প্রলেতারিয়েতকে শাসকশ্রেণীর পদে উন্নীত করা সহজ কাজ নয়। শাসকশ্রেণীর পদে অধিষ্ঠিত বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য যে রাষ্ট্রযন্ত্র তৈরি করেছে, সেই রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস না করে প্রলেতারিয়েত কখনোই নিজেকে শাসকশ্রেণীর পদে উন্নীত করতে পারে না। তাই প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য হলো এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করা। কুগেলমানের কাছে লেখা মার্কসের ঐ চিঠির মধ্য দিয়ে এই পথনির্দেশই ঘোষিত হয়েছে। মার্কসের সময় পর্যন্ত ইতিহাসে যত বিপ্লবই ঘটেছে সে-সব বিপ্লবই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলার পরিবর্তে বরং সেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাকাপোক্ত করে তুলেছে। সে-সব বিপ্লবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে এক শ্রেণীর শোষকের কাছ থেকে আর এক শ্রেণীর শোষকের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে মাত্র, কিন্তু শোষণ ব্যবস্থার অবসান করা হয়নি। ১৭৮৯ সালের মহান ফরাসী বিপ্লবের কথা আমরা ইতিহাসে পড়ে থাকি। সে-বিপ্লবে ফরাসী দেশে সামন্ততন্ত্রের কর্তৃত্বের অবসান করে বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দখল করেছিল। কিন্তু সে বিপ্লবে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটেনি—শোষণের রূপটা শুধু পালটিয়েছিল; ভূমিদাস ব্যবস্থার জায়গায় এসেছিল মজুরি-দাসত্ব ব্যবস্থা, পুঁজিপতিদের শোষণ ব্যবস্থা। মনে রাখা দরকার যে, শোষণ ব্যবস্থার অবসান ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আসতে পারে না। তাই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আনাই যে বিপ্লবের লক্ষ্য সেই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের কাজ হবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করা।

কিন্তু কি ভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করা হবে? এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে বলপ্রয়োগ করে এবং সেটাই হলো বিপ্লব। এ বিপ্লব যে সমাজ বিপ্লব সেটা আগেই আমরা দেখেছি সমাজ বিপ্লবের অধ্যায়ে।

কিন্তু কেন ধ্বংস করতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে? কেন করতে হবে বলপ্রয়োগ?—প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই দুটি প্রশ্নই বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সামনে হাজির হয়েছিল এবং এই দুটি প্রশ্নের জবাবও দিয়েছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস।

প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতার পরই মার্কস ও এঙ্গেলস "কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো"র ১৮৭২ সালের সংস্করণের ভূমিকায় লিখলেন:

"কমিউন বিশেষ করে একটি কথা প্রমাণ করেছে যে, তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্রটা শুধু দখলে পেয়েই শ্রমিকশ্রেণী তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না।"

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বক্তব্য ব্যাখ্যা করে লেনিন তাঁর "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থে লিখলেন : "মার্কসের অভিমত হলো এই যে শ্রমিকশ্রেণী আগের তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে শুধু দখল করেই ক্ষান্ত হবে না, শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই সেই যন্ত্রটি ভেঙে চুরমার করতে হবে।"

শুধু কি তাই ? না, শুধু তাই নয়। শ্রমিকশ্রেণীকে আগেকার তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে শুধু দখল করেই ক্ষান্ত থাকলে চলবে না, শ্রমিকশ্রেণীকে ঐ যন্ত্রটি ভেঙে চুরমার করতে হবে, আর ওর জায়গায় স্থাপন করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।

কিন্তু এর জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন কেন ? বলপ্রয়োগ ছাড়া কোনো সমাজ বিপ্লব আদৌ সম্ভব নয়। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত বিপ্লব ঘটেছে তার মূলে ছিল বলপ্রয়োগ। যাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে তারা কি কখনো স্বেচ্ছায় সে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় ? না, দেয় না ; বলপ্রয়োগ করেই তাদের উচ্ছেদ করতে হয়। ইতিহাসে বলপ্রয়োগের একটা বিপ্লবী ভূমিকা আছে। দাস ব্যবস্থা, সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের ধারার মধ্য দিয়েই বলপ্রয়োগের বিপ্লবী ভূমিকা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এই বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই দুনিয়ার এক-চতুর্থাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বলপ্রয়োগের এই বাস্তব ফল আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এই বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এঙ্গেলস বলেছিলেন : "ইতিহাসে বলপ্রয়োগের আরও একটা ভূমিকা আছে—বিপ্লবী ভূমিকা ; মার্কসের কথায়, প্রাচীন সমাজের গর্ভ থেকে নতুন সমাজের জন্মকালে বলপ্রয়োগই ধাত্রীর কাজ করে। সামাজিক আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে এই বলপ্রয়োগ একটি অনুকূল হাতিয়ার স্বরূপ ; এই হাতিয়ারের সাহায্যেই অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা সামাজিক আন্দোলন মৃত শিলীভূত রাষ্ট্ররূপ চূর্ণ করে সবলে নিজের পথ কেটে চলে।"

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে চুরমার করার যে শিক্ষা প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেই শিক্ষাকে রাশিয়ার বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে লেনিন দেখালেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীকে বৈপ্লবিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে বলপ্রয়োগের পদ্ধতি, বুর্জোয়াদের সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটিকে ধ্বংস করতে হবে এবং বুর্জোয়া একনায়কত্বের জায়গায় সংস্থাপিত করতে হবে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব।

আজ যারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে, পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করে থাকে তাদের পূর্বসূরীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে লেনিন ঘোষণা করেছিলেন :

"মার্কসের শিক্ষাকে বিদ্রূপ করে এই সব ভদ্রলোকেরা, কাউৎস্কী সমেত সুবিধাবাদীরা জনসাধারণকে এই শিক্ষাই দিতে চায় যে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রলেতারিয়েতকে প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে হবে, পরে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে সমাজতন্ত্র।

"কিন্তু আমরা মার্কসের শিক্ষা আর রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলি: প্রলেতারিয়েতকে প্রথমে বুর্জোয়া শ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং নিজেদের জন্য জয় করে নিতে হবে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং তারপরে সেই রাষ্ট্রক্ষমতাকে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে ব্যবহার করতে হবে মেহনতী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সহানুভূতি অর্জন করবার উদ্দেশ্যে নিজেদের শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবে।" (লেনিন: সংবিধান সভার নির্বাচন ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ১৯১৯)।

দুনিয়ার কোন শাসকশ্রেণীই সংগ্রাম ছাড়া কোনদিন পরাজয় স্বীকার করেনি এবং করবেও না। আর নিজেদের ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য সাধারণতঃ প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি প্রথমে হিংসার পথ, গৃহযুদ্ধের পথ গ্রহণ করে, তারাই প্রথমে বেয়নেট উঁচু ক'রে আক্রমণ শুরু করে। এর জন্যই প্রয়োজন হচ্ছে বিপ্লবের।

১৮

বিপ্লবের স্তর

মানব সমাজের অগ্রগতি ঘটেছে সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে। বিপ্লবের ধারায় সমাজের বিকাশ ঘটেছে এবং এবং এই বিকাশ ঘটেছে শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে। সমাজ বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের অগ্রগতির পথে এক ধরনের সমাজ থেকে আর এক ধরনের সমাজের আবির্ভাব স্বাভাবিকভাবে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঘটেনি, ঘটেছে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। দাস সমাজের সামন্ত সমাজে উত্তরণ, আবার সামন্ত সমাজের ধনতন্ত্রী সমাজে উত্তরণ এবং বর্তমানে দুনিয়ার এক বিরাট অংশে ধনতন্ত্রী সমাজের সমাজতন্ত্রী সমাজে উত্তরণ —এ সবই ঘটেছে বিপ্লবের মাধ্যমে। বিপ্লবই হচ্ছে ইতিহাসের চালক-যন্ত্র।

কিন্তু বিপ্লবের বিভিন্ন স্তর আছে। বর্তমানকালে বিপ্লবের দুটি স্তরের সঙ্গেই আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। সে দুটি স্তর হলো বুর্জোয়া বিপ্লব আর প্রলেতারীয় বিপ্লব, অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, আর সমাজ-

তান্ত্রিক বিপ্লব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের এবং প্রলেতারিয়েতের পার্টির যোগসূত্র খুব স্পষ্ট এবং তার কারণও বেশ পরিষ্কার, কেননা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই প্রলেতারিয়েতকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে, নিজেকে শাসকশ্রেণীর স্তরে উন্নীত করতে হবে। কিন্তু এই করণীয় কাজের সঙ্গে বুর্জোয়া বিপ্লবের সম্পর্ক কি এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের যোগসূত্র কোথায় ?

বুর্জোয়া বিপ্লব আর প্রলেতারীয় বিপ্লব—এই দুটি বিপ্লবের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা এর নাম থেকেই সুস্পষ্ট। এ দুটি বিপ্লবের লক্ষ্য ভিন্ন রকমের আর এদের করণীয় কাজও ভিন্ন রকমের। তবে কোনো দেশেই বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন না করে প্রলেতারীয় বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। আবার একই সময়ে এক আঘাতেই এই দুটি বিপ্লব সম্পন্ন করা যায় না। বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করার পরেই আসে প্রলেতারীয় বিপ্লব সম্পন্ন করার দায়িত্ব ও কাজ। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে তখনকার জার্মানির বিপ্লব সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছিলেন : "জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লব হবে অব্যবহিত পরবর্তী প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভূমিকা মাত্র।"

সাধারণ কথায় বুর্জোয়া বিপ্লবের করণীয় কাজ হচ্ছে : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের সমস্ত অবশেষের উচ্ছেদ করা এবং ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশের অবস্থা কায়েম করা ; এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্রের সমস্ত অবশেষের উচ্ছেদ করা এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার, সংসদীয় গণতন্ত্র, আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই করণীয় কাজের কথা বিচার করেই বুর্জোয়া বিপ্লবকে প্রায়ই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আরও সহজ কথায়, গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়ে থাকে।

প্রলেতারীয় বিপ্লব হচ্ছে প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সাধারণ কথায় প্রলেতারীয় বিপ্লবের করণীয় কাজ হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায়সমূহে পুঁজিবাদী মালিকানার উচ্ছেদ করা এবং সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রলেতারীয় গণতন্ত্র, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

যেসব দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত হয়নি, সেসব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির কর্তব্য হচ্ছে সেই বুর্জোয়া বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সেই বিপ্লবকে সমাপ্ত করা। বুর্জোয়া বিপ্লবকে সমাপ্ত করেই শ্রমিকশ্রেণীকে প্রলেতারীয় বিপ্লব জয়যুক্ত করার পথে অগ্রসর হতে হবে।

মার্কস শ্রমিকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাবার কাজ আর বুর্জোয়া বিপ্লব সুসম্পন্ন করার কাজ অচ্ছেদ্যভাবে

যুক্ত। গণতন্ত্রের জন্য এবং সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যদি সংগ্রাম না করা হয় তা হলে প্রলেতারীয় বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না। তাই মার্কস সর্বদাই শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার নির্দেশ দিতেন এবং এই অংশগ্রহণ হচ্ছে প্রলেতারীয় বিপ্লব আরম্ভ করার দিকে একান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস এই বক্তব্যই উপস্থিত করেছিলেন জার্মানির বিপ্লবের ক্ষেত্রে। এই বিপ্লবে কমিউনিস্টদের কর্তব্য সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস লিখলেন: "জার্মানিতে বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী অভিযান করে তখনই কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে লড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও জমিদারতন্ত্র ও পেটিবুর্জোয়ার (মূল জার্মান Kleinburgeri: মার্কস ও এঙ্গেলস এই কথাটা ব্যবহার করেছিলেন শহরবাসী পেটিবুর্জোয়ার প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলির অর্থে—সম্পাদক) বিরুদ্ধে।"

সঙ্গে সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্টদের মূল কাজ সম্বন্ধে সচেতন থাকার নির্দেশ দিয়ে লিখলেন: "কিন্তু বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈরীবিরোধ বর্তমান, তার যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বীকৃতিটা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় না; এইজন্য যাতে বুর্জোয়াশ্রেণী নিজ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আসতে বাধ্য জার্মান মজুরেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে; এই জন্যই যাতে জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির পতনের পর যেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে।"

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্টদের এই শিক্ষাই দিলেন যে, বুর্জোয়া বিপ্লবের বিজয়ের পরমুহূর্তে শ্রমিকশ্রেণীকে এগিয়ে এসে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে পরবর্তী স্তরে, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের সংগ্রামের দিকে—বুর্জোয়া বিপ্লবের সংগ্রাম থেকে সোজা প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের দিকে; বুর্জোয়াদের কিছুতেই ক্ষমতায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া হবে না, তাদের ধনতান্ত্রিক শোষণ চালিয়ে যেতে দেওয়া হবে না; সংগ্রামের সমস্ত উদ্যোগ প্রলেতারিয়েতের পার্টিকে নিতে হবে এবং বুর্জোয়া বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে প্রলেতারীয় বিপ্লবের স্তরে, মাঝপথে থামবার কোনো অবকাশ নেই প্রলেতারিয়েতের; আর এর জন্য প্রলেতারিয়েতকে প্রস্তুত হতে হবে। তাই "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে" মার্কস ও এঙ্গেলস লিখলেন: "কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানির দিকে মন দিচ্ছে কারণ সে দেশে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব আসন্ন, ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকতর

অগ্রসর পরিস্থিতির মধ্যে তা ঘটতে বাধ্য এবং ঘটবে সতেরো শতকের ইংল্যান্ড ও আঠারো শতকের ফ্রান্সের তুলনায় অনেক বিকশিত এক প্রলেতারিয়েত নিয়ে। এবং এই কারণে যে জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লব হবে অব্যবহিত পরবর্তী প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভূমিকা মাত্র।"

মার্কস ও এংগেলসের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যে কথাটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো তা হলো এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বুর্জোয়া বিপ্লবের অর্থ এই নয় যে, বুর্জোয়াদের শাসনক্ষমতায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া হবে, ধনতন্ত্রকে বেশ দীর্ঘকাল ধরে বিকশিত হতে দেওয়া হবে এবং শোষণকে কায়েম থাকতে দেওয়া হবে ; বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার সংগে সংগেই শ্রমিকশ্রেণীকে প্রলেতারীয় বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে হবে। মার্কস ও এংগেলসের এই মতবাদকেই বলা হয়ে থাকে নিরন্তর বিপ্লবের, চিরস্থায়ী বিপ্লবের, নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের মতবাদ। ১৮৫০ সালে "কমিউনিস্ট লীগের প্রতি" বক্তৃতায় মার্কস এই তত্ত্ব আরও পরিষ্কার করে উপস্থিত করেন। যেসব বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দাবি আদায় করার জন্য কমিউনিস্টদের লড়তে হবে, তা বর্ণনা করার পর মার্কস তাঁর ঐ বক্তৃতায় নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব সম্বন্ধে বলেছেন :

"বড়জোর উপরিউক্ত দাবিগুলো আদায় হয়ে যাবার পরই গণতান্ত্রিক পেটি-বুর্জোয়ারা যতশীঘ্র সম্ভব বিপ্লবকে থামিয়ে দিতে চায় ; কিন্তু আমাদের কর্তব্য, আমাদের স্বার্থ হলো বিপ্লবকে চিরস্থায়ী করা যতদিন পর্যন্ত না অল্পবিস্তর সম্পত্তিবান শ্রেণীরা ক্ষমতাচ্যুত হয়, যতদিন পর্যন্ত না শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, যতদিন পর্যন্ত না দুনিয়ার শুধু এক দেশের নয়, সমস্ত প্রধান দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের ফলে এইসব দেশের শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয় এবং অন্ততঃ প্রধান প্রধান উৎপাদক শক্তিগুলো শ্রমিক-শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।"

১৮৪৮-৫০ সালে ইউরোপের দেশে দেশে যে বিপ্লবের যুগ চলেছিল সেই যুগে মার্কস শ্রমিকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের জন্য সংগ্রামে বুর্জোয়াদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীকে সমর্থন জানাতে হবে এবং বুর্জোয়াদের এই সংগ্রামে ঠেলে দিতে হবে। এই বিপ্লবের সাফল্যের ফলে বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে সত্য, কিন্তু শ্রমিক-শ্রেণীকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল না করা পর্যন্ত বিপ্লব চালিয়ে যাওয়াই হবে শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য। এ থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাবার কাজ আর বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করার কাজ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। গণতন্ত্রের জন্য এবং সামন্ততন্ত্র ও

স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যদি সংগ্রাম না করা হয় তাহলে প্রলেতারীয় বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এই অংশগ্রহণ হচ্ছে প্রলেতারীয় বিপ্লব আরম্ভ করার দিকে একান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই হচ্ছে মার্কসের শিক্ষা।

মার্কসের এই শিক্ষাকে সাম্রাজ্যবাদের যুগে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিকশিত করলেন এবং বাস্তবে রূপায়িত করলেন লেনিন।

লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, এযুগে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের যুগে—যে যুগটা হচ্ছে আবার প্রলেতারীয় বিপ্লবের পূর্বাহ্ন, সেযুগে কোনো দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে হলে, সমাপ্ত করতে হলে এ বিপ্লবের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীকেই গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত রেখে মাঝপথে আপস করতে চায়। এই বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীকেই সমাপ্ত করতে হবে এবং তার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে তার প্রধান মিত্র হিসাবে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়কেই সমাবেশ করতে হবে; আর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের ফল হিসাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় বুর্জোয়াশ্রেণীকে অধিষ্ঠিত করা হবে না, রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক ও কৃষকদের নিজেদের হাতে নিতে হবে। লেনিন সেই রাষ্ট্রক্ষমতার সংজ্ঞা দিলেন "শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব"। মার্কসবাদী চিন্তাধারায় লেনিন নতুন ধারার সংযোজন করলেন। সেটি হলোঃ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোস্যাল ডেমোক্রাসির দুই কৌশল" গ্রন্থেই লেনিন তাঁর এক নতুন তত্ত্ব বিবৃত করলেন।

১৯০৫ সালের রুশদেশের বিপ্লব ছিল একান্তভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এ বিপ্লবের করণীয় কাজ ছিল জারের স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন আর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ধনতান্ত্রিক শাসনের উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এই বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল না।

এই বিপ্লবের পূর্বাহ্নে রুশ দেশের সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির মধ্যে এই বিপ্লবের কর্মধারা সম্পর্কে দুটি পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা আত্মপ্রকাশ করেছিল। একটি হলো মেনশেভিক চিন্তাধারা, আর একটি হলো বলশেভিক চিন্তাধারা।

মেনশেভিকরা এই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণকে হেয় প্রতিপন্ন করার, বিপ্লব থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে দূরে সরিয়ে রাখারই চেষ্টা করেছিল। তারা বলতো, যেহেতু এটা বুর্জোয়া বিপ্লব সেহেতু উদারনৈতিক বুর্জোয়ারাই এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করবে; কৃষকদের সঙ্গে নয়, উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গেই শ্রমিক-

শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, এবং এই বিপ্লবের ফলে যদি একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে সে সরকার হবে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সরকার এবং শ্রমিকশ্রেণী সেই সরকারে অংশগ্রহণ করবে না।

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলো। তারা এই অভিমত ব্যক্ত করলো যে, সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে শ্রমিকশ্রেণীকেই এই বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। তারা জার সরকারের উচ্ছেদের জন্য এবং তার জায়গায় অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানেরই আহ্বান জানালো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলো যে, এই সরকারে শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করবে। তারা এই কথাও ঘোষণা করলো যে, জনসাধারণের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জারের সঙ্গে আপস করাই উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের লক্ষ্য, কাজেই তাদের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

লেনিন বললেন ঃ "মার্কসবাদ প্রলেতারিয়েতকে এই শিক্ষাই দেয় যে, সে বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে দূরে থাকতে পারে না, বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না, বরং এই শিক্ষাই দেয় যে, সে যেন বিপ্লবে একান্ত উদ্দীপনা সহকারে অংশগ্রহণ করে, প্রকৃত প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের জন্য এবং বিপ্লবকে তার যথার্থ পরিণতিতে পেঁছে দেবার জন্য সে যেন অত্যন্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞভাবে সংগ্রাম করে।"

লেনিন আরও বললেন ঃ "আমরা যেন কিছুতেই না ভুলি যে বর্তমানকালে সমাজতন্ত্রকে নিকটতর করতে হলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র অর্জন করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নেই, থাকতেও পারে না।"

লেনিন দেখালেন ঃ "এক হিসাবে বুর্জোয়া বিপ্লব বুর্জোয়াদের চেয়ে প্রলেতারিয়েতের পক্ষেই বেশি লাভজনক।...রাজতন্ত্র, স্থায়ী সৈন্যদল ইত্যাদি প্রাচীন যুগের লুপ্তাবশেষ যা রয়েছে, প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সেগুলির উপর নির্ভর করা বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সুবিধাজনক। বুর্জোয়া বিপ্লব যদি দৃঢ়ভাবে অতীতের লুপ্তাবশেষকে সম্পূর্ণ সরিয়ে না দেয়, অর্থাৎ বিপ্লব প্রকৃতই যদি যথার্থ বিপ্লব না হয়, বিপ্লব যদি সম্পূর্ণ না হয় এবং সুদৃঢ় ও নির্মমভাবে না চলে তাহলে বুর্জোয়াশ্রেণীরই সুবিধা। ...বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে হলে যে পরিবর্তন প্রয়োজন তা যদি আরও ধীরে ধীরে, আরও ক্রমানুক্রমিক-ভাবে, আরও সাবধানে, এবং কম জোরের সঙ্গে বিপ্লবের পদ্ধতিতে না হয়ে সংস্কারের পদ্ধতিতে ঘটে...এইসব পরিবর্তনের ফলে যদি সাধারণ লোক অর্থাৎ কৃষক এবং শ্রমিকদের স্বতন্ত্র বিপ্লবী কার্যক্রম, উদ্যোগ ও উৎসাহ যথাসম্ভব

অল্প বিকাশলাভ করে, তাহলে বুর্জোয়া শ্রেণীর আরও সুবিধা, কারণ অন্যথা শ্রমিকরা আরও সহজে ফরাসী প্রবাদবাক্য অনুসারে—'বন্দুকটা এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে নেবে,' অর্থাৎ যে অস্ত্র বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে তাদের হাতে আসবে, যে স্বাধীনতা বিপ্লব আনবে, দাসত্বমুক্ত ভূমিতে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভূত হবে, তা শ্রমিকরা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে। অপর পক্ষে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবার পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি যদি সংস্কারের মারফত না হয়ে বিপ্লবের মারফত হয়, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীরই সুবিধা বেশি ; কারণ সংস্কারের পথ হলো মন্দগতির পথ, দীর্ঘসূত্রতার পথ, জাতির শরীরের বিভিন্ন পচা অংশ তিলে তিলে ক্ষয় হওয়ার যন্ত্রণাদায়ক পথ। শ্রমিক এবং কৃষকেরাই সবচেয়ে আগে, আর সবচেয়ে বেশি এই পচন পদ্ধতির জন্য যন্ত্রণা পেয়ে থাকে। তাড়াতাড়ি পচা অংশগুলি কেটে ফেলা হলো বিপ্লবের পথ, প্রলেতারিয়েতের পক্ষে এটা হলো সবচেয়ে কম যন্ত্রণাজনক। পচা, দূষিত অংশগুলি সোজাসুজি বাদ দেওয়ার রাস্তা, রাজতন্ত্র এবং তার আনুষঙ্গিক জঘন্য, ঘৃণ্য, পূতিগন্ধময় ও সংক্রামক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সবচেয়ে কম আমল দেওয়া এবং তাদের স্বার্থের দিকে নজর না দেওয়ার রাস্তা হলো বিপ্লবের রাস্তা।"

এভাবেই লেনিন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কর্তব্য নির্ধারণ করলেন এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-শ্রেণীকে নেতৃত্ব করার আহ্বান জানালেন। লেনিন নির্দেশিত কমিউনিস্ট পার্টির এই নতুন কর্মধারার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে স্তালিন লিখলেনঃ "পূর্বের পরিস্থিতি ছিল এই যে, বুর্জোয়া বিপ্লবে—দৃষ্টান্তস্বরূপ পশ্চিম ইউরোপে—বুর্জোয়াশ্রেণী প্রধান ভূমিকায় নামতো, প্রলেতারিয়েত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বুর্জোয়াদের পিছনে পিছনে চলতো এবং কৃষকেরা বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রয়োজন মতো ব্যবহারের মজুদ শক্তি থাকতো। মার্কসবাদীরা মনে করতো যে এ রকম যোগাযোগ অল্পাধিক অনিবার্য, আর সঙ্গে সঙ্গে একথা জুড়ে দিত যে শ্রেণী হিসাবে জরুরী দাবিগুলির জন্য প্রলেতারিয়েতকে যথাসম্ভব সংগ্রাম করতেই হবে এবং নিজের রাজনৈতিক পার্টি গড়তেই হবে। লেনিন বললেন যে, এখন ইতিহাসের নতুন পর্যায়ে পরিস্থিতি এমনভাবে বদলাচ্ছে যে, প্রলেতারিয়েতই বুর্জোয়া বিপ্লবের চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে, বিপ্লবের নেতৃত্ব থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ঠেলে ফেলা হচ্ছে এবং কৃষক সম্প্রদায় প্রলেতারিয়েতেরই মজুদ শক্তি হয়ে উঠছে।" (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস)।

কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত করেই কি প্রলেতারিয়েত থেমে যাবে, তার চরম লক্ষ্যের দিকে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে কমিউনিজমের দিকে কি

সে এগিয়ে যাবে না ? এ রকম প্রশ্ন যাতে না উঠতে পারে এবং কোনোরকম ভুল ধারণার যাতে উদয় না হয় তার জন্য লেনিন "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির দুই কৌশল', গ্রন্থে পরিষ্কারভাবেই ঘোষণা করলেন ঃ "স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধকে বলপ্রয়োগে চূর্ণ করবার জন্য এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অনিশ্চিত মনোবৃত্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্য কৃষক সাধারণের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পূর্ণ সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধকেও বলপ্রয়োগে চূর্ণ করবার জন্য এবং কৃষক সম্প্রদায় ও নিম্নমধ্যবিত্তদের অনিশ্চিত মনোবৃত্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্যও জনগণের মধ্যে যারা আধা-প্রলেতারিয়েত তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে পূর্ণ সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এটাই হলো প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর কর্তব্য।

লেনিন আরও বললেন ঃ "পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য, সুসংগত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, সাধারণতন্ত্রের জন্য সমগ্র জনগণের এবং বিশেষতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের পুরোভাগে দাঁড়াও। সমাজতন্ত্রের জন্য সমস্ত মেহনতী ও শোষিত জনগণের পুরোভাগে দাঁড়াও। কার্যতঃ বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের নীতি হলো এই বিপ্লবের সময় শ্রমিকদের পার্টির প্রতি পদক্ষেপ নির্ধারিত হবে এবং প্রতিটি কৌশলগত সমস্যার সমাধান হবে এই শ্রেণীগত স্লোগানের প্রয়োগ দ্বারাই।"

লেনিনের এই কার্যধারাই বাস্তবে রূপায়িত হলো ১৯১৭ সালের দুটি রুশ বিপ্লবে—মার্চ আর নভেম্বর বিপ্লবে। তাই লেনিন তাঁর "প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউৎস্কি" গ্রন্থে লিখলেন ঃ "যেভাবে ঘটবে বলে আমরা বলেছিলাম ঠিক সেইভাবেই ঘটনাবলী ঘটেছে। বিপ্লব যে গতি গ্রহণ করেছে তাতে আমাদের যুক্তির সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমে 'সমগ্র' কৃষকের সঙ্গে মিলে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে, মধ্যযুগীয় শাসনের বিরুদ্ধে (এবং এ পর্যন্ত বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লবের, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই থাকছে) তারপর গরিব কৃষকদের সঙ্গে, আধা-প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে, সমস্ত শোষিতের সঙ্গে মিলে গ্রামের ধনী, কসাক, মুনাফাখোর সমেত ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এগুতে হবে এবং এখানে বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হচ্ছে।"

এভাবে লেনিন "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর" "জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লব হবে অব্যবহিত পরবর্তী প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভূমিকামাত্র" বক্তব্যটিকে আরও বিকশিত করলেন, সমৃদ্ধ করলেন মার্কসের নিরবচ্ছিন্ন, নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বকে। যাতে কোনো কিছু অস্পষ্ট না থাকে তার জন্য 'দুই কৌশল' বইটি প্রকাশিত হবার দু'মাস পরে "কৃষক আন্দোলনের প্রতি সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের

মনোভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে লেনিন লিখলেন ঃ "গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আমরা অবিলম্বে এবং ঠিক আমাদের শক্তি অর্থাৎ শ্রেণীসচেতন ও সুসংহত প্রলেতারিয়েতের শক্তি অনুপাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করবো। আমরা নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের পক্ষপাতী। আমরা মাঝপথে থেমে যাবো না।"

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির কাছে এই হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আর প্রলেতারীয় বিপ্লবের যোগসূত্র। এই যোগসূত্রই রুশদেশের ১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব আর নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

নভেম্বর বিপ্লবের পর পদানত দেশে দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নতুন চরিত্র বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাই পদানত দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আজ যে রূপ ধারণ করছে তা হলো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। মনে রাখা দরকার যে আজকের দিনে গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগের গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে যুগে শ্রমিকশ্রেণী আর তার রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ছেড়ে দিতে পারে না, কারণ বুর্জোয়াশ্রেণী মাঝপথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। বর্তমান যুগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাবার আবশ্যিক সোপান হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীকেই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে হবে। আজকের দিনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত পুরোনো ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়—এ হচ্ছে নতুন ধরনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব যা সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে। তাই বর্তমানে বিপ্লবের স্তর দুটি হলো এইরূপ ঃ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লবের এই স্তরকে ডিঙিয়ে একেবারে সমাজতন্ত্র, কমিউনিজমে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আবার এক আঘাতেই দুটি বিপ্লব করা যায় না, একটি সমাপ্ত করে পরবর্তী বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে হয়।

বিপ্লবের এই দুই স্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানতে হবে। এই দুটি স্তরকে এক করে দেখলে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে গুলিয়ে ফেললে মারাত্মক ভুল করা হবে।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান হলো ঃ শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। অন্যদিকে প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান হলো ঃ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। এটি হলো বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে প্রথম পয়েন্ট।

কিন্তু বিপ্লবের দুটি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানার দৃঢ়

উক্তির অর্থ কোনোমতেই এ নয় যে, বিপ্লবের একটি স্তরের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিটি কাজ সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লব ঠিক তার পরবর্তী স্তরে যেতে পারে না। বিপ্লবের দুই স্তরের মধ্যে "কোনো চীনের প্রাচীর খাড়া করা, প্রলেতারিয়েতের প্রস্তুতির ডিগ্রি ও গরিব কৃষকের সংগে প্রলেতারিয়েতের ঐক্যের ডিগ্রি ছাড়া আর কিছু দিয়ে এই দুই স্তরকে আলাদা করার প্রচেষ্টার অর্থ হলো মার্কসবাদকে জঘন্যভাবে কদর্থ করা, মার্কসবাদের জায়গায় উদারনীতিবাদকে প্রতিস্থাপিত করা" (লেনিন)। বর্তমান যুগে বিপ্লবের দুটি স্তরকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবাহের যোগসূত্র হিসাবে দেখতে হবে এবং বিপ্লবের একটি স্তর এবং আর একটি স্তরের মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর খাড়া করা যেতে পারে না—এটি হলো বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে দ্বিতীয় পয়েন্ট।

তাই যেসব দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এখনো অসমাপ্ত সেসব দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির কর্মসূচীতে দুটি ভাগ থাকে—একটি হলো সর্বাধিক কর্মসূচী, অপরটি হলো সর্বনিম্ন কর্মসূচী। সর্বাধিক কর্মসূচীতে থাকে চরম লক্ষ্যের কথা, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা, কমিউনিজমে পৌঁছাবার লক্ষ্যের কথা, অর্থাৎ ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা। কিন্তু সর্বনিম্ন কর্মসূচীতে থাকে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে যে সকল আশু উদ্দেশ্য সফল করতে হবে তারই কার্য-তালিকা। এই সর্বনিম্ন কর্মসূচীই বিপ্লবের নিম্নস্তরে পার্টি কর্মসূচীর প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের পার্টি—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কর্মসূচীতে বলা হয়েছে: "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গড়ে তোলার লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ়ভাবে নিষ্ঠাবান (৮৭ নং ধারা)।"—এটাই হচ্ছে সর্বাধিক কর্মসূচী। কিন্তু ঐ ৮৭ নং ধারায়ই বলা হয়েছে: "সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠবান থাকার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অর্থনৈতিক বিকাশের এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক সংগঠনের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত পরিপক্কতার মাত্রা বিবেচনা করে সমস্ত খাঁটি সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির কোয়ালিশনের ভিত্তিতে জনগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে আশু লক্ষ্য হিসাবে জনগণের সামনে উপস্থিত করছে; এই কোয়া-লিশনের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিকশ্রেণী। এর জন্য সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে বর্তমান বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্র ও সরকারকে অপসারিত করে তার জায়গায় শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর দৃঢ়ভিত্তির উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একটি মেহনতী জনগণের রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করা।" এটাই হচ্ছে সর্বনিম্ন কর্ম-সূচী এবং বিপ্লবের বর্তমান স্তরে পার্টি কর্মসূচীর প্রধান বিষয়বস্তু।

এককথায় আমাদের পার্টি কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হলো : বুর্জোয়া জমিদার-শ্রেণীর শ্রেণীশাসনের অবসান ঘটানো এবং তার জায়গায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তন করা। আমাদের পার্টি কর্মসূচীর ৯২নং ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে : "এটা স্পষ্ট যে ভারতীয় বিপ্লবের মৌল কর্তব্য-সমূহের সুসম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ সমাধানের জন্যে বর্তমান স্তরে বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রধান বুর্জোয়া-জমিদার সরকারকে অপসারিত করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা চূড়ান্ত প্রয়োজন।"

বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে তৃতীয় পয়েন্ট হলো প্রধান দ্বন্দ্বটি নির্ধারণ করা। আমাদের পার্টির কর্মসূচীতে বর্তমান স্তরে আমাদের বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এ বিপ্লব হলো মূলতঃ সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক (৯৬ নং ধারা)। এই স্তরে যেটি প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে সেটি হলো সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদারতন্ত্র আর বিশাল কৃষক জনসাধারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব—রাজনৈতিক সংজ্ঞানুসারে এই দ্বন্দ্ব হচ্ছে একদিকে বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত জমিদারী ব্যবস্থার সমর্থক ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষক বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্র আর অপর দিকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে আগ্রহশীল সমগ্র জনসাধারণ—এই দু'-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব।

বিপ্লবের স্তরের আলোচনা প্রসঙ্গে দুটো জিনিস মনে রাখা দরকার। প্রথমত, বিপ্লবের এক একটি স্তরে সমস্যার মূল জিনিস নির্ধারিত করতে হবে কেবলমাত্র দেশের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাস্তব ক্ষেত্রে বিরাজিত শ্রেণী-গত প্রকৃত অবস্থা গণ্য করেই নয়, এই মূল জিনিস নির্ধারিত করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা ও সংগঠনের বিষয়ীগত উপাদানকে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির অবস্থাকেও গণ্য করে। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের একটি স্তরেই সেই স্তরের সমস্ত লক্ষ্য সাধিত হবে ও সব কাজ সম্পন্ন হবে এবং তারপর শুরু হবে পরবর্তী স্তর, এ রকম যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘটনা ঘটে না। বিপ্লবের একটি স্তরের নির্দিষ্ট কাজ সেই স্তরে সম্পূর্ণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না, সে কাজ পরবর্তী স্তরে সম্পন্ন করতে হবে। যেমন রুশদেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত করণীয় কাজ কি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল ? না, হয়নি। পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক স্তরেই সে কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে পারা গিয়েছিল। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি আমরা চীনের বিপ্লব সম্বন্ধে স্তালিনের বক্তব্যটা স্মরণ করি।

স্তালিন চীনের বিপ্লবের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই তিনটি স্তরের করণীয় কাজের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন : "প্রথম স্তরের

(এটা হচ্ছে সাধারণ যুক্তফ্রন্টের স্তর যখন বিপ্লব আঘাত হানছিল প্রধানতঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল—লেখক) বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তখন বিপ্লবের আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে প্রধানতঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের (এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর—লেখক) বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানে এখন বিপ্লবের আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে প্রধানতঃ অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে, এবং মুখ্যত সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্য কি প্রথম স্তরে পূর্ণ হয়েছিল ? না, হয়নি। এই স্তর এই লক্ষ্য সাধনের দায়িত্ব দ্বিতীয় স্তরকে দিয়েছে এবং সেই দায়িত্ব চীনের বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তর উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে। বিপ্লবের প্রথম স্তর কেবলমাত্র প্রাথমিক ধাক্কা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী জনগণকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং এইভাবেই শেষ হয়েছিল এই স্তরের গতিধারা। কর্তব্য সম্পন্নের দায়িত্ব অর্পিত হলো আগামীকালের উপর। এটা ধরে নিতেই হবে যে, বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরও তার সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার লক্ষ্য সাধনে সম্পূর্ণভাবে সাফল্য অর্জন করবে না। বিপ্লবের এই দ্বিতীয় স্তরও আর একটি ধাক্কা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের শ্রমিক-কৃষককে জাগিয়ে তুলবে। যাতে বিপ্লবের আদর্শ চীনের বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে সোভিয়েত স্তরে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে তার জন্যই বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তর শ্রমিক-কৃষককে ঐ ভাবে জাগিয়ে তুলবে।”

স্তালিন নির্দেশিত এই পথেই চীনের বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটেছে এবং বিপ্লব সফল হয়ে উঠেছে।

ভারতের ক্ষেত্রেও বিপ্লবের এই তিনটি স্তরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে এই তিনটি স্তরের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম স্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ যুক্তফ্রন্টের স্তর শেষ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে বর্তমান স্তর অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। আর তৃতীয় স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর।

১৯

ভারতের বিপ্লবের স্তর প্রসঙ্গে

ভারতের ক্ষেত্রে বিপ্লবের স্তরের আলোচনা করা দরকার, কারণ বিপ্লবের স্তর অনুসারেই তো আমাদের কর্মসূচী রচিত হয়েছে এবং সে কর্মসূচী এক দীর্ঘ সংগ্রামেরই ফল।

আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট। আমরা স্বাধীন হয়েছি সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা জনগণের হাতে আসেনি। আমাদের দেশের বিপ্লবের প্রথম স্তর ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ যুক্তফ্রণ্টের স্তর। সে স্তরের অবসান ঘটেছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের সংগে সংগে।

আমাদের পার্টির [সি পি আই (এম)-এর] কর্মসূচীর ৩নং ধারায় বলা হয়েছে :—

"...দেশ ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয় এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হাতে হস্তান্তরিত হয়। এইভাবে ভারতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া-বর্গের নেতৃত্বে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগে ভারতীয় বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের—মুখ্যত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ সংযুক্ত মোর্চা পর্যায়ের—সমাপ্তি ঘটে।"

ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের নেতৃত্বে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো তার শ্রেণী-চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসংগে পার্টি কর্মসূচীর ৫৬নং ধারায় বলা হয়েছে :

'বর্তমান ভারত রাষ্ট্র হচ্ছে বুর্জোয়াদের ও জমিদারদের শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র ; এর নেতৃত্বে আছে বৃহৎ বুর্জোয়ারা—ধনতান্ত্রিক বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে যারা ক্রমেই বেশি বেশি করে বিদেশী ফিনান্স মূলধনের সংগে সহযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে।"

যে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র এই, সে রাষ্ট্রে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে পারে না তা তো অবধারিত। "আমাদের জনগণ আশা করেছিলেন যে, নবগঠিত জাতীয় রাষ্ট্র দেশের ঔপনিবেশিক অতীতের কুৎসিত অবশেষ-গুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, আমাদের উৎপাদিকা শক্তি সমূহের উপর থেকে সকল শৃংখলকে বিলুপ্ত করে দেবে এবং জনগণের সৃজন শক্তিকে বাধামুক্ত করে দেবে। তাঁরা সাগ্রহে এই আশা পুষে রেখেছিলেন যে, ভারত দ্রুতবেগে তার অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা ও পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠবে। অভাব ও দারিদ্র্যকে নির্বাসিত করবে এবং জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পরিপূরণের ক্রমবর্ধমান

ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সমৃদ্ধশালী শিল্পশক্তিরূপে অভ্যুদিত হবে। তাদের আশা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে।" (৭নং ধারা—পার্টি কর্মসূচী)।

স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে থাকার ফলেই জনগণের আশা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেনি তার নিজেরই দুর্বলতার জন্য। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, বুর্জোয়াশ্রেণী যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের, সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল থেকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্বে থাকে তা হলে তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, মাঝপথে তারা আপস করে। ফলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত থেকে যায়। ভারতের গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবও অসমাপ্ত থেকে গেল। আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে পরিষ্কার-ভাবে বলা হয়েছে ঃ

"যদিও শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ, মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহ ও প্রগতিশীল বুদ্ধি-জীবী গোষ্ঠীই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে প্রধান সংগ্রামী শক্তি এবং এরাই সহ্য করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী আক্রোশের প্রধান আঘাত, তা সত্ত্বেও কিন্তু মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে যায় বুর্জোয়াশ্রেণীরই হাতে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় রাষ্ট্র ভারতীয় বিপ্লবের জরুরী কর্তব্যগুলি সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌল কর্তব্যগুলি পুরোপুরি সম্পাদন করলে তার সম্ভাব্য ফলাফল কি হতে পারে, তাতে শংকিত হয়ে বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গ সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপস করল এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণে সম্মতি দিল, সংগে সংগে ব্রিটিশ ফিন্যান্স মূলধনকে তার লুণ্ঠন চালিয়ে যেতে দিতেও সম্মতিদান করল। দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায়—যে গণ-অভ্যুত্থান রাজন্যবর্গের স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দেবার মুখে যাচ্ছিল, তার পটভূমিকায় সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গকে দেওয়া হল বিবাট বিরাট সুবিধা আর তাদের কাছে যাচ্ঞা করা হল তাদের মৈত্রী, যাতে করে বুর্জোয়াদের শ্রেণী-রাজত্বকে জোরদার করা যায়। যে জমিদারেরা এতদিন ছিল ব্রিটিশ শাসকদের সমর্থক, তারাই এখন সাদরে আমন্ত্রিত হল কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে। ব্রিটিশের কাছ থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত আমলাতন্ত্রকে কংগ্রেস শাসকেরা অটুট রেখে দিল, যাতে করে জনগণকে দমন করা যায়। এইভাবে, না দেওয়া হল গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বেগ সঞ্চার করতে, না পূর্ণ করা হল তার মৌল কর্তব্যগুলিকে।" (৯নং ধারা)

..."বুর্জোয়াশ্রেণীর যে দ্বৈত চরিত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের বছরগুলিতে তার অনুসৃত কর্মনীতির মধ্যে—একদিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সমাবেশ

করা এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপস করার মধ্যে—আত্মপ্রকাশ করত, সেই দ্বৈত চরিত্রই আবার স্বাধীনতা লাভের পরে নতুন আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র এবং অন্যদিকে বুর্জোয়াশ্রেণীসহ জনগণ—এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের কল্যাণে নতুন নতুন সুযোগের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, রাষ্ট্রের নেতৃত্বাসীন বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের উপরে চূড়ান্ত আঘাত হেনে তাদের উচ্ছেদ করা থেকে বিরত থাকছে; অন্যদিকে রাষ্ট্রের উপরে নিজের কর্তৃত্বকে ও নতুন সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়ে সে নিজের অবস্থানকে আরও জোরদার করতে চেষ্টা করছে এবং এই কারণে সে একদিকে জনগণের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সংগে তার যেসব দ্বন্দ্ব সেগুলিকে চাপ, দরকষাকষি ও আপসের সাহায্যে সমাধান করতে চেষ্টা করছে। এই প্রক্রিয়ায় সে বিদেশী একচেটিয়া কারবারের সংগে শক্ত গাঁটছড়া গড়ে তুলছে এবং জমিদারদের সংগে ক্ষমতা ভাগাভাগি করছে। এইভাবে, কয়েকটি ভারী শিল্প-প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করতে সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে দরকষাকষি করতে এবং নিজেকে গড়ে তুলতে সমাজতান্ত্রিক সাহায্যকে কাজে লাগাতে দ্বিধা না করলেও, সে চরিত্রের দিক থেকে জনগণ বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং ভারতীয় বিপ্লবের গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্তব্যকার্য সম্পাদনের ঘোর বিরোধী থেকে যাচ্ছে।" (১৫ নং ধারা)।

উপরে উল্লেখিত আমাদের পার্টি কর্মসূচীর বক্তব্য থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, (১) আমাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত এবং (২) এই বিপ্লবকে সমাপ্ত করতে হলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।

এই প্রসংগে আর একটা জিনিস মনে রাখা দরকার। সেটা হলো এই যে, স্বাধীনতালাভের পর রাষ্ট্রক্ষমতায় সমাসীন হয়ে আমাদের দেশের বুর্জোয়ারা দেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ বেছে নিল। কিন্তু কোন্ যুগে তারা ধনতন্ত্রের বিকাশের পথ বেছে নিল? আর ভারতীয় ধনতন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি? এ সম্বন্ধে আমাদের পার্টি-কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ঃ

(১) "...এমন এক যুগে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ বেছে নিল, যে যুগে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্রুত ভাঙনের পথে যাচ্ছে এবং তা ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে;" (১২নং ধারা)

(২) "কিন্তু ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর না আছে ভারী শিল্পের উপযোগী কারিগরি ভিত্তি, না আছে কোনো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য যা লুঠ করে সাম্রাজ্য-

বাদীরা বিপুল পরিমাণ মূলধন সঞ্চয় করতে পেরেছিল ; আর এই কারণেই নিজেরা মূলধনের প্রয়োজন মেটাবার ও ধনতন্ত্রের পথে অর্থনীতির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের শ্রমের ফলকে আত্মসাৎ করার জন্য সে কাজে লাগালো নবলব্ধ রাষ্ট্রশক্তিকে। (১২ নং ধারা)

(৩) "...ধনতান্ত্রিক পথে বিকশিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজ এখনো পর্যন্ত তার অভ্যন্তরে নানাবিধ প্রবল শক্তিশালী প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকে ধারণ করে আছে। অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনতন্ত্র গড়ে উঠেছিল উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা বিধ্বস্ত প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের ভস্মস্তূপের উপরে ; ভারতে সেরূপ ঘটেনি ; এখানে ধনতন্ত্রকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের উপরেই। প্রায় দুইশত বছর ধরে যারা ভারতের উপর শাসন চালিয়েছে সেই ব্রিটিশ উপনিবেশতন্ত্রীরাও নয়, ১৯৪৭ সালে যাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল সেই ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীও নয়—এ দুয়ের কেউই প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী আঘাত হানেনি ; প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে এই বিধ্বংসী আঘাত ধনতান্ত্রিক সমাজের অবাধ বিকাশের জন্যও যেমন একটি আবশ্যিক কর্তব্য আবার ধনতান্ত্রিক সমাজের জায়গায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যও তেমন একটি আবশ্যিক কর্তব্য। সেই কারণেই বর্তমান ভারতীয় সমাজ বর্ণগত, সম্প্রদায়গত ও উপজাতিগত প্রতিষ্ঠানাদিসহ একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক আধিপত্যের এক বিচিত্র সমাবেশ।" (৮৬ নং ধারা)

ভারতের এই সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপের কথাটা সব সময়ে মনে রাখতে হবে। ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের এই যে বিশেষ রূপ তা আমাদের দেশে ধনতন্ত্রের সংকট ও দ্বন্দ্বসমূহকে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী করে রাখছে। আমাদের রাষ্ট্রের শীর্ষে সেই সব শক্তিই অধিষ্ঠিত যারা ধনতান্ত্রিক ও প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজে পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বলেই চিহ্নিত। এরা হলো বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছে এমন সব দেশী একচেটিয়া বুর্জোয়ারা, প্রাক্তন মহারাজা ও জমিদারেরা, বিকাশোন্মুখ বা সদ্য বিকশিত পুঁজিবাদী জমিদারেরা, বর্ণগত, সম্প্রদায়গত ও উপজাতিগত প্রতিষ্ঠান সমূহের নেতারা। প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাৎপদ শক্তিসমূহের জোটের বিরুদ্ধে সচেতন শ্রমিকশ্রেণীকে ও তার মিত্রদের লড়াই করতে হবে।

এই যখন অবস্থা তখন যে কোন ধরনের ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বসমূহ ও সংকট ভারতীয় ধনতান্ত্রিক সমাজেও প্রযোজ্য, এ হেন ছককাটা ফরমুলা খাড়া করে কোন লাভ হবে না। যেটা করা দরকার সেটা হলো ভারতীয় সমাজের মধ্যে বিকশিত সংকটের বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তির বাস্তব বিশ্লেষণ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান ভারতীয় সমাজে পাশাপাশি অবস্থান

করছে বর্ণগত, সম্প্রদায়গত ও উপজাতিগত সামাজিক সংগঠনের মধ্য থেকে উদ্ভূত প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের বিভিন্ন স্তর ও মতাদর্শ আর এই সমাজেই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্রুত বিকাশ ঘটছে।

সেজন্য আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হিসাবে বলা হয়েছে ঃ "...যাতে করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা দ্রুত পূর্ণতাসাধন ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্র রচনা করা সহজসাধ্য করা যায় সেই জন্য প্রাক্-ধন-তান্ত্রিক সমাজের ধ্বংস সাধনে এবং অভ্যন্তরস্থ বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সংহতি সাধনে আগ্রহশীল সেই সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব এসে পড়েছে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির উপর।" (৮৬ নং ধারা)

অর্থাৎ ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ও তার বিপ্লবী পার্টির আশু কর্তব্য হলো ভারতের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করা।

২০

ভারতের বিপ্লব এখন কোন স্তরে এবং করণীয় কাজটা কী?

ভারতের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাপ্ত করতে হলে আমাদের দেশের বিপ্লবের বর্তমান স্তর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের করণীয় কাজ সম্বন্ধেও স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের বর্তমান বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে পার্টি কর্মসূচীতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে ঃ

(১) "বিকাশের বর্তমান স্তরে আমাদের বিপ্লবের প্রকৃতি মূলত সামন্ত-তন্ত্র বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, একচেটিয়াবাদ বিরোধী ও গণতান্ত্রিক।

(২) "আমাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যে যুগে শ্রমিকশ্রেণী আর তার রাজনৈতিক দলের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ অবধারিত।

(৩) "এটা বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত পুরানো ধরনের গণ-তান্ত্রিক বিপ্লব নয়। এ হচ্ছে নতুন ধরনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব যা সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর অধিনেতৃত্বে।" (৯৬ নং ধারা)

বিপ্লবের এই স্তরের করণীয় কাজ সম্পর্কে পার্টি কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ঃ

(১) "আমাদের কৃষির সেই সঙ্গে শিল্পে উৎপাদিকা শক্তির উপর থেকে সামন্ততান্ত্রিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলির শৃংখল ভেঙে ফেলার জন্য

সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সবচেয়ে প্রথম ও সবচেয়ে প্রধান যে কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে, তা হলো কৃষক সমাজের স্বার্থে আমূল ভূমি সংস্কারের বাস্তব রূপায়ণ, এরই অনুপূরক কাজ হিসাবে যা করতে হবে তা হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থার ব্যাপক রদবদল, কেননা এই সামাজিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই বর্ণভেদ প্রথার মতো প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজের সব অবশেষগুলি যুগ যুগ ব্যাপী পশ্চাদপদতার মধ্যে গ্রামকে বেঁধে রাখে। অবশ্য সামাজিক ব্যবস্থায় এই ধরনের ব্যাপক রদবদলের ব্যাপারটা কৃষি বিপ্লবের সম্পূর্ণতা সাধনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কেননা বাস্তবিক পক্ষে কৃষি বিপ্লবই হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অক্ষস্বরূপ।"

(২) "......জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বিতীয় জরুরী কর্তব্য হচ্ছে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি থেকে বিদেশী একচেটিয়া মূলধনকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করে তাকে অচিরাৎ আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা এবং আমাদের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে বিদেশী একচেটিয়া মূলধনের সর্বনাশা প্রভাব থেকে মুক্ত করা।...*

(৩) "......এরই সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে একচেটিয়া মূল্যধনের ক্ষমতাকে ভেঙে দেওয়া।" (৯৭নং ধারা)।

আমাদের দেশের বিপ্লবের বর্তমান স্তর এবং বিপ্লবের মৌল করণীয় কাজ নির্ধারিত হওয়ার পর যেটা আলোচনা করা প্রয়োজন সেটা হলো আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্য কি, প্রধান শক্তি কারা, আশু মজুদ বাহিনী কারা, কিভাবে আমাদের সংগ্রামের শক্তির বিন্যাস ঘটাতে হবে এবং বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার জন্য কাদের নিয়ে ফ্রন্ট গঠন করতে হবে, আর সে ফ্রন্টের নেতৃত্বে থাকবে কারা। সংক্ষেপে আমাদের বিপ্লবের রণনীতিটা কি, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত দরকার। এটা না থাকলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারবো না।

স্তালিন রণনীতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটা আমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে। স্তালিনের কথায়ঃ "রণনীতি হচ্ছে বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে শ্রমিকশ্রেণী কোথায় প্রথম আঘাত হানবে তাই স্থির করতে বিপ্লবের (মুখ্য ও গৌণ) মজুত বাহিনীর বিন্যাস পরিকল্পনা করা এবং বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরের আগাগোড়া ঐ পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার জন্য লড়াই চালানো।"

এই সংজ্ঞা অনুসারে বিপ্লবের একটি নির্দিষ্ট স্তরে নির্ধারণ করতে হবে—

(১) বিপ্লবের মূল লক্ষ্য কি ?

(২) বিপ্লবের প্রধান বাহিনী কারা ?

(৩) আশু মজুদ বাহিনী কারা ?

(৪) আঘাতের প্রধান লক্ষ্য কি ?

(৫) বিপ্লবী বাহিনীর বিন্যাস পরিকল্পনা কি রকম হবে ?

আমাদের পার্টি কর্মসূচীর বিভিন্ন ধারায়ই এই পাঁচটি পয়েন্টের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সে ব্যাখ্যা হলো নিম্নরূপ ঃ—

(১) আমাদের বিপ্লবের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে পার্টি কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ঃ

"সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে বর্তমান বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্র ও সরকারকে অপসারিত করে তার জায়গায় শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর দৃঢ় ভিত্তির উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একটি মেহনতী জনগণের রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করা।" (৮৭ নং ধারা)

"এটা স্পষ্ট যে, ভারতীয় বিপ্লবের মৌল কর্তব্যসমূহের সুসম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ সমাধানের জন্য বর্তমান স্তরে বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান বুর্জোয়া-জমিদার সরকারকে অপসারিত করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা চূড়ান্ত প্রয়োজন।" (৯২ নং ধারা)

"...জমিদারতন্ত্রের সংগে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ বর্তমান বৃহৎ বুর্জোয়া নেতৃত্বকে রাষ্ট্রক্ষমতার নেতৃস্থানীয় অবস্থান থেকে স্থানচ্যুত করে তার জায়গায় রাষ্ট্রের উপর শ্রমিকশ্রেণীর অধিনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা... ।" (৯৩ নং ধারা)

এককথায় আমাদের বিপ্লবের বর্তমান স্তরের, অর্থাৎ আমাদের দেশের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্য হলো ঃ বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর শ্রেণীশাসনের অবসান ঘটানো এবং তার জায়গায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তন করা।

(২) আমাদের বিপ্লবের প্রধান বাহিনী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী। বিপ্লবকে জয়যুক্ত করতে হলে বিপ্লবের নেতৃত্বের ভূমিকা শ্রমিকশ্রেণীকেই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে ঃ "ইতিহাসের দিক থেকে আধুনিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণী এই ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের কালের সমগ্র অভিজ্ঞতা এই মতকে বারংবার প্রমাণ করে দিয়েছে।" (১০০ নং ধারা)

(৩) আমাদের বিপ্লবের আশু মজুত বাহিনী হলো ঃ (ক) সমগ্র কৃষক—ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষক, মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষক। এর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর "মূল মিত্র" (পার্টি কর্মসূচীর ১০২ নং ধারা) হচ্ছে ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষক "আস্থাভাজন" (পার্টি কর্মসূচীর ১০২ নং ধারা) মিত্র হচ্ছে মাঝারি কৃষক, আর ধনী কৃষককেও মিত্র হিসাবে রাখতে হবে। ধনী কৃষককে কখনোই শত্রু-শিবিরে ঠেলে দেওয়া চলবে না। মনে রাখা দরকার যে, অবিভক্ত কমিউনিস্ট

পার্টির ১৯৪৮-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে (কলকাতা) গৃহীত থিসিসে এক আঘাতে বিপ্লবের দুটো স্তরের কাজ—গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে ধনী কৃষককে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এর ফলে আমাদের কাজে তখন হঠকারী বিচ্যুতি ঘটেছিল এবং সেই থিসিসের জন্য আমাদের অনেক খেসারৎ দিতে হয়েছিল। এ সব কথা মনে রেখেই আমাদের পার্টি কর্মসূচীর ১০৩ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ "বিদেশী ও ভারতীয় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের দ্বারা কবলিত বাজারের লুঠের শিকার হবার কারণে ধনী কৃষক প্রায়ই বুর্জোয়া-জমিদার সরকারের অনুসৃত পীড়নমূলক নীতিসমূহের বিরুদ্ধে চলে আসে। সেজন্য মোটামুটিভাবে তাদেরও গণতান্ত্রিক মোর্চায় **নিয়ে আসা যেতে পারে** এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের **মিত্র হিসাবে রাখা যেতে পারে**।"

(মোটা হরফ লেখকের)

(খ) শহরের মধ্যবর্তী শ্রেণী ও অন্যান্য মধ্যবর্তী শ্রেণী (পার্টি কর্মসূচীর ১০৪ নং ধারা)

(৪) আমাদের বিপ্লবের আঘাতের প্রধান লক্ষ্য হলো ঃ বৃহৎ বুর্জোয়া-বর্গ ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিবর্গ এবং জমিদারবর্গ (পার্টি কর্মসূচীর ৯৮ নং ধারা)।

(৫) বিপ্লবী বাহিনীর বিন্যাস পরিকল্পনার ব্যাপারে আমাদের গড়ে তুলতে হবে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা মোর্চা। এই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের স্বরূপটা কি হবে, এর নেতৃত্বে থাকবে কারা এবং এই ফ্রন্ট গঠিত হবে কাদের নিয়ে, অর্থাৎ এই ফ্রন্টে কারা আসবে বা কাদের নিয়ে আসতে হবে এই সব বিষয় সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে রয়েছে।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করতে হবে। এই ফ্রন্ট বা মোর্চা আগেকার দিনের অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকালের আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্তরের সর্বব্যাপক সাধারণ জাতীয় সংযুক্ত ফ্রন্ট বা মোর্চা হতে পারে না। বিপ্লবের বর্তমান স্তরে এই ফ্রন্টের বা মোর্চার রূপই আলাদা। এই ফ্রন্টের নেতৃত্বে থাকবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টি—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করার জন্য পার্টিকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পার্টির এই দায়িত্ব সম্বন্ধে পার্টি কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ঃ

"…কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি সমূহের সঙ্গে—প্রাক ধনতান্ত্রিক সমাজের যাবতীয় অবশেষের যাঁরা অবসান ঘটাতে চান, কৃষক সমাজের স্বার্থে সর্বাঙ্গীণভাবে কৃষি বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে চান, বিদেশী মূলধনের সমস্ত চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করতে চান এবং ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক

ও সাংস্কৃতিক জীবনের আমূল পুনর্গঠনের পথে যে সব প্রতিবন্ধক আছে সেগুলোকে অপসারণ করতে চান, তাঁদের সকলের সঙ্গে—ঐক্যবদ্ধ হতে চেষ্টা করে।" (১১০ নং ধারা)

এই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা মোর্চার মর্ম ও ভিত্তি হবে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী। এই ফ্রণ্টে সমগ্র কৃষককে (ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষক, মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষককে) নিয়ে আসতে হবে। ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষক হচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণীর মূল মিত্র, মাঝারি কৃষক হচ্ছে আস্থাভাজন মিত্র—এদের এই ফ্রণ্টে নিয়ে আসা সহজ, কিন্তু ধনী কৃষককে "গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে নিয়ে আসা যেতে পারে এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্র হিসাবে রাখা যেতে পারে" (১০৩ নং ধারা) ...তাছাড়া "শহরের মধ্যবর্তী শ্রেণী ও অন্যান্য মধ্যবর্তী শ্রেণীও গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের মিত্র হতে পারে এবং হবে। বিপ্লবের সপক্ষে তাদের নিয়ে আসার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা দরকার।" (১০৪ নং ধারা)

এই জনগণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে সেই সব অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদেরও স্থান থাকবে "যাদের বিদেশী একচেটিয়াদের সঙ্গে একেবারেই কোন সংযোগ নেই কিংবা সংযোগ থাকলেও তা স্থায়ী নয়, যারা নিজেরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে না এবং একচেটিয়া কারবারীদের হাতে নানাভাবে নিগৃহীত হয়ে থাকে... ।"

(১০৬ নং ধারা)

বুর্জোয়াশ্রেণীর এই স্তর জনগণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে সামিল হতে পারে একথা বলেও পার্টি কর্মসূচীর ঐ ১০৬ নং ধারায়ই বলা হয়েছে ঃ—

"অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে তারা এখনো একই রাষ্ট্রক্ষমতায় বৃহৎ বুর্জোয়াদের অংশীদার এবং তারা এখনো বুর্জোয়াদের আওতায় আরো অগ্রগতি সাধনের সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করে।"

আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য জনগণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠনের মৌল কর্তব্য আমাদের এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হলে চলবে না। আমাদের এ কথাও সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, "শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে মর্মকেন্দ্র করে সমস্ত দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির বৈপ্লবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যসমূহকে বাস্তবে রূপায়িত করার যে সংগ্রাম তা এক জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। নানা অবস্থায় নানা পর্যায়ে এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।" (১১১ নং ধারা)

এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে দক্ষ এরকম পার্টিই আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে ঃ

"যে পার্টি তার সদস্যবৃন্দকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় নিরন্তর শিক্ষিত ও পুনঃশিক্ষিত করে তোলে সেই পার্টিই—একমাত্র সেই পার্টিই পারে

শ্রেণীশক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনের সংগে সংগে সময়োপযোগী সমস্ত সংগ্রামের রূপকে আয়ত্ত করতে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের গতিতে যে সমস্ত বাঁক ও মোড় দেখা দিতে বাধ্য, সে সবের মধ্য দিয়ে জনগণকে পরিচালন করতে কেবল সেই পার্টিই সক্ষম।" (পার্টি কর্মসূচীর ১১১ নং ধারা)

২১

বিপ্লবের মুলসূত্র কি ?

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কথাই কমিউনিস্টরা বলে থাকে এবং এটাই হলো শ্রেণীসচেতন শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে। অর্থাৎ বিপ্লবের মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে.; সংসদীয় গণতন্ত্রের, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে শ্রমিকশ্রেণী কখনোই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে না। বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী কখনোই স্বেচ্ছায় শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেয় না, নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তারা নিজেদের তৈরি সংবিধানকে বাতিল করতে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে পদদলিত করতে দ্বিধা করে না। বুর্জোয়াশ্রেণীই গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেয়। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আশা শ্রমিকশ্রেণী করে না।

কিন্তু "বিপ্লব চাই" বলে চিৎকার করলেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল হয়ে যায় না। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য যে বিপ্লবের প্রয়োজন তার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাতে হবে, বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ করে শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে, বিপ্লবকে সফল করার মতন যোগ্য শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করতে হবে। শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার পূর্বে, বিপ্লব শুরু করার পূর্বে দেশের পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে দেশের পরিস্থিতি বিপ্লব শুরু করার উপযোগী কি না, অর্থাৎ দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে কি না।

নিছক অভিলাষ ও বিপ্লবের বুলি দিয়ে বিপ্লবকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিপ্লবের মূলসূত্র আছে। বিপ্লবের এই মূলসূত্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলে এবং এই মূলসূত্র যথাযথভাবে উপলব্ধি করে প্রয়োজনানুসারে কাজ করতে না পারলে বিপ্লব সফল করা যায় না।

লেনিন বিপ্লবের এই মূলসূত্র বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি শ্রমিকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, (১) বিপ্লবী পরিস্থিতি ছাড়া বিপ্লব ঘটতে পারে না ; (২) কিন্তু প্রত্যেকটি বিপ্লবী পরিস্থিতিতে বিপ্লব সংঘটিত হয় না ; (৩) বিপ্লবের জন্য চাই সুদক্ষ সুসংগঠিত বিপ্লবী পার্টি—এরকম পার্টি যদি শ্রমিকশ্রেণীর না থাকে, তাহলে চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকলেও বিপ্লব ঘটে না ; (৪) বিপ্লব সফল করতে হলে চূড়ান্ত আঘাত হানার মুহূর্ত বেছে নিতে হয় ; (৫) এই সঠিক মুহূর্ত নির্ধারণের দূরদৃষ্টি ও যোগ্যতা বিপ্লবী পার্টিকে অর্জন করতে হবে এবং এই পার্টিকে মনে রাখতে হবে যে, জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পার্টিকে জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সব সময়ে খেয়াল রাখতে হবে।

কিন্তু বিপ্লবী পরিস্থিতি বলতে কী বোঝায় ? এই প্রশ্নের উত্তর লেনিন তাঁর "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন" গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : মার্কসবাদীদের কাছে এটা তর্কাতীত যে, বিপ্লবী পরিস্থিতি ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব ; অধিকন্তু প্রত্যেকটি বিপ্লবী পরিস্থিতিতেই বিপ্লব ঘটে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিপ্লবী পরিস্থিতির লক্ষণগুলি কি ? আমরা যদি নিম্নে প্রদত্ত তিনটি প্রধান লক্ষণকে দেখাই তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ভুল করব না : (১) যখন শাসকশ্রেণীর পক্ষে অপরিবর্তিত অবস্থায় তাদের শাসন বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে, যখন "উচ্চ শ্রেণীগুলি"র মধ্যে একভাবে বা অন্যভাবে সংকট দেখা দেয়, যখন শাসকশ্রেণীর কর্মনীতির মধ্যে এমন সংকট দেখা দেয়, যে সংকট এমন ফাটল সৃষ্টি করে—যার মধ্য দিয়ে নিপীড়িত শ্রেণীর অসন্তোষ ও ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ ফেটে পড়ে। সাধারণতঃ বিপ্লব সংঘটিত হবার পক্ষে নিচু শ্রেণীগুলির পুরানো পন্থায় বাঁচার "অনিচ্ছাই" যথেষ্ট নয়, "উচ্চ শ্রেণীগুলি"কে পুরানো পন্থায় বাঁচতে অক্ষম হওয়া চাই। (২) যখন নিপীড়িত শ্রেণীর দুঃখকষ্ট ও অভাব সাধারণ প্রচলিত অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। (৩) যখন উল্লিখিত কারণগুলির পরিণাম হিসাবে জনগণের কর্মতৎপরতা বেশ কিছু বেড়েছে—এই জনগণই "শান্তির" সময়ে শান্তভাবে নিজেদের লুণ্ঠিত হতে দেয়, কিন্তু প্রচণ্ড আলোড়নের সময় সংকটকালীন অবস্থার চাপে এবং "উচ্চ শ্রেণীগুলির" চাপেও স্বাধীন ঐতিহাসিক সংগ্রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

"বাস্তব পরিবর্তন যে শুধুমাত্র বিভিন্ন গ্রুপ এবং পার্টির ইচ্ছানিরপেক্ষ তাই নয়, এগুলি বিভিন্ন শ্রেণীরও ইচ্ছানিরপেক্ষ—এই সব বাস্তব পরিবর্তন ছাড়া সাধারণ নিয়ম হিসাবে বিপ্লব অসম্ভব। এই সব বাস্তব পরিবর্তনের সমষ্টিকে বলা হয় বিপ্লবী পরিস্থিতি।"

এই সংজ্ঞা অনুসারে কোন দেশে যদি বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করে, তাহলেই কি বিপ্লব ঘটে যাবে? না, তা নয়, বিপ্লব অত সহজে ঘটে না, আর প্রত্যেকটি বিপ্লবী পরিস্থিতিতেই বিপ্লব সংঘটিত হয় না।

বিপ্লবী পরিস্থিতি কাকে বলে তার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়ার পর উল্লিখিত প্রবন্ধেই লেনিন আরও লিখেছিলেনঃ "এই ধরনের অবস্থা (অর্থাৎ বিপ্লবী পরিস্থিতি—লেখক) ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে এবং পশ্চিমেও সমস্ত বিপ্লবী যুগে ছিল, এই অবস্থা বিগত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে জার্মানিতে ছিল এবং ১৮৫৯-৬১ ও ১৮৭৯-৮০ সালে ছিল রাশিয়াতে, যদিও এই সব ক্ষেত্রে কোন বিপ্লব হয়নি। কেন? কারণ সব বিপ্লবী পরিস্থিতিতেই বিপ্লব হয় না; বিপ্লব একমাত্র সেই অবস্থাতেই হয় যখন উল্লিখিত বাস্তব বা বিষয়গত পরিবর্তনের সংগে সংগে একটি বিষয়ীগত পরিবর্তন যুক্ত হয় অর্থাৎ বিপ্লবী শ্রেণী যখন পুরানো সরকারকে ভাঙার (বা স্থানচ্যুত করবার) মতো যথেষ্ট শক্তিশালী বিপ্লবী গণসংগ্রাম পরিচালনা করার ক্ষমতা অর্জন করে, কেননা আপনা থেকে কখনো সরকারের 'পতন হয় না', তার পতন ঘটাতে হয়।

বিপ্লব সম্বন্ধে এই হলো মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু বিষয়ীগত পরিবর্তন বলতে কী বুঝায়? বিষয়ীগত পরিবর্তন বলতে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা, দক্ষতা ও সক্ষমতার কথাই বলেছেন। বিপ্লবী পার্টি, যে পার্টি বাস্তব অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ করে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার, বিপ্লবকে সঠিক পথে পরিচালনা করার ক্ষমতা অর্জন করেছে সে রকম পার্টি না থাকলে বিপ্লবী পরিস্থিতিতেও বিপ্লব সংঘটিত হয় না। অন্যদিকে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে কিনা তা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা বিপ্লবী পার্টির থাকা দরকার। এই দক্ষতা না থাকলে বিপথগামী হবার, একবার ডানে চলার, আর একবার বামে চলার প্রবণতা দেখা দিতে বাধ্য এবং এর ফলে বিপ্লবেরই ক্ষতি হয়।

তাহলে প্রধান কথা হল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিচার করে স্থির করা দরকার দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে কিনা। যদি বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে তাহলে কমিউনিস্টদের কাজ হলো "জনগণের কাছে বিপ্লবী পরিস্থিতিকে তুলে ধরা এবং তার গভীরতা ও সম্ভাবনাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলা, প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর বিপ্লবী সচেতনতা ও বিপ্লবী দৃঢ় সংকল্প জাগিয়ে তোলা, সেই সচেতনতা ও দৃঢ় সংকল্প যাতে বিপ্লবী কার্যকলাপে রূপান্তরিত হতে পারে, তাতে সাহায্য করা এবং সেই উদ্দেশ্যে বিপ্লবী পরিস্থিতির পক্ষে উপযোগী সংগঠনসমূহ গড়ে তোলা।" (লেনিন)

সংগঠন গড়তে না পারলে, পার্টি গড়ে তুলতে না পারলে কখনোই বিপ্লব সফল করা যায় না। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হলো তার বিপ্লবী সংগঠন। যারা কল্পনাবিলাসী, যারা ধৈর্য ধরতে নারাজ, যারা লম্ফ দিয়ে পাহাড় ডিঙাবার সুখস্বপ্নে বিভোর তারা বিপ্লবী পরিস্থিতির লক্ষণ দেখলেই চিৎকার করে বলে থাকে বিপ্লবের জয় সুনিশ্চিত। তারা আবার অনেক সময় বিপ্লবী পরিস্থিতিরও ধার ধারে না, নিজেদের অভিলাষ অনুযায়ী বিপ্লবের ডংকা বাজিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিয়ে বলে থাকে—বিপ্লব এসে গেছে। এদের ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভুল।

বিপ্লবের জয় কখনোই আপনা থেকে আসে না। বিপ্লব জয় করে আনতে হয়। কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিশালী, সুদক্ষ বিপ্লবী পার্টি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি করতে পারে এবং বিপ্লবী পরিস্থিতিতে বিপ্লবকে সফল করতে পারে। বিপ্লবী পরিস্থিতিতে এমন সব মুহূর্ত দেখা দেয়, যখন বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তি কেঁপে ওঠে, কিন্তু তবুও বিপ্লব সফল হয় না। এর কারণ হলো এই যে, তখনো জনগণকে পরিচালিত করার ও ক্ষমতা দখল করার মতন শক্তিশালী বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে ওঠেনি। বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে বিপ্লবী পরিস্থিতিকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে যথোপযুক্ত ব্যবহার করার মতন সুদক্ষ, সুসংগঠিত বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে হবে এবং এই পার্টিকে বিপ্লবের মূল সূত্র যথাযথ উপলব্ধি করে কাজ করতে হবে।

কিন্তু বিপ্লব সফল হতে পারে কখন? লেনিনের কথায়ঃ 'সকল বিপ্লবের দ্বারা, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর তিনটি রুশ বিপ্লবের দ্বারা বিপ্লবের যে মূলসূত্র সমর্থিত হয়েছে তাহলো এইঃ বিপ্লবের পক্ষে এটাই যথেষ্ট নয় যে, শোষিত ও নির্যাতিত জনগণ পুরানো অবস্থায় জীবনযাপন করা অসম্ভব বোধ করছে এবং তার পরিবর্তন দাবি করছে। বিপ্লবের পক্ষে এটাও আবশ্যক যে, শোষকশ্রেণীরা আর পুরানো পন্থায় টিকতে পারছে না, শাসন চালাতে পারছে না। যখন 'নিম্নশ্রেণীরা' পুরানো ব্যবস্থাকে চাচ্ছে না, আর 'উচ্চশ্রেণীরা' পুরানো ব্যবস্থাকে চালিয়ে যেতে পারছে না—তখনই শুধু বিপ্লব সফল হতে পারে। এই সত্যকে অন্যভাবেও প্রকাশ করা যায়ঃ (শোষক ও শোষিত উভয়কেই প্রভাবান্বিত করবে এমন) সারাদেশ জোড়া সংকট ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব। এর থেকেই আসে বিপ্লবের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এই দিকগুলি—প্রথমতঃ অধিকাংশ শ্রমিক (অন্ততঃ শ্রেণীসচেতন, চিন্তাশীল, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় শ্রমিকদের অধিকাংশ) সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে এবং বিপ্লবের জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছে। দ্বিতীয়তঃ, শাসকশ্রেণী সরকার পরিচালনার ব্যাপারে

এমন এক সংকটের মধ্যে পড়েছে যা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ জনগণকেও রাজনীতির মধ্যে টেনে আনছে (প্রত্যেকটি সত্যিকারের বিপ্লবের লক্ষণ হলো এই যে এত-কাল শোষিত আর নির্যাতিত যেসব জনগণ ছিল নিষ্ক্রিয়, তাদের মধ্যে রাজ-নৈতিক লড়াই চালাতে সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে—দশ গুণ এমন কি ত্রিশ গুণ), সরকারকে দুর্বল করছে, এবং তার উচ্ছেদ বিপ্লবীদের পক্ষে সহজসাধ্য করে তুলছে।" (বামপন্থী কমিউনিজম—শিশুসুলভ বিশৃংখলা।)

কিন্তু বিপ্লবকে জয়যুক্ত করতে হলে ব্যাপক মেহনতী জনগণকে বিপ্লবের দিকে নিয়ে আসতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, মেহনতী জনগণের ব্যাপক অংশকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অগ্রণী বাহিনীর দিকে, কমিউনিস্ট পার্টির দিকে নিয়ে আসতে না পারলে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। মেহনতী জনগণের ব্যাপক অংশকে কমিউনিস্ট কর্মপন্থার দিকে নিয়ে আসার জন্য শুধু প্রচারকার্যই যথেষ্ট নয়—এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা। বিপ্লবের মূলসূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন ঃ "একমাত্র অগ্রণী অংশকে নিয়েই জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। সমগ্র শ্রেণী, জনগণের ব্যাপক অংশ যতক্ষণ না অগ্রণী অংশকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করছে বা তাদের প্রতি মৈত্রীভাব রেখে নিরপেক্ষতার মনোভাব গ্রহণ করছে, অন্ততঃ শত্রুপক্ষকে কোনোমতেই সমর্থন করতে এগোচ্ছে না—এরকম অবস্থার আগে অগ্রণী অংশকে চূড়ান্ত সংগ্রামে ঠেলে দেওয়াটা শুধু মূর্খতা নয়, অপরাধও বটে। আর সমগ্র শ্রেণী, মেহনতী জনগণের ব্যাপক অংশ এবং পুঁজির দ্বারা যারা নিপীড়িত সেই জনগণ বাস্তবিকপক্ষে যাতে এইরূপ একটা অবস্থায় পেঁছিতে পারে তার জন্য প্রচারাভিযানই (প্রোপাগান্ডা ও অ্যাজিটেশন) যথেষ্ট নয়। এর জন্য চাই জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা। এই হলো বড় বড় বিপ্লবের মূলসূত্র।" (বামপন্থী কমিউনিজম—শিশুসুলভ বিশৃংখলা।)

বিপ্লব সফল করতে হলে চূড়ান্ত আঘাত হানার মুহূর্ত বাছাই করে নিতে হয়। শাসকশ্রেণীর সংকট যখন চরমে পেঁছেছে, যখন তাদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে এবং যখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আর মেহনতী জনগণের অন্যান্য অংশ তাদের সমর্থন করতে তৈরি হয়েছে তখন বুঝতে হবে যে, চরম আঘাত হানার শুভ মুহূর্ত সমাগত।

এ সম্পর্কে লেনিনের নির্দেশ খুব স্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন, "যখন আমাদের বিরুদ্ধপক্ষের সমস্ত শ্রেণী-শক্তিগুলি মোক্ষমভাবে প্যাঁচে পড়েছে, নিজেদের মধ্যে চরম খাওয়া-খাওয়ি শুরু করেছে, খাওয়া-খাওয়ি করতে গিয়ে নিজেদের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে, "যখন সমস্ত

দোলায়মান, অস্থিরমতি, মধ্যবর্তী স্তরগুলি অর্থাৎ বুর্জোয়াদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে যে পেটিবুর্জোয়া আর পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা রয়েছে তাদের স্বরূপ জনসাধারণের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে, কার্যক্ষেত্রে দেউলেপনার ফলে তারা জনসাধারণের চোখে যথেষ্ট হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে," "যখন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বেপরোয়া বিপ্লবী আক্রমণ চালানোর সমর্থনে ব্যাপক মনোভাব দেখা গেছে এবং তা দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে—তখনই চূড়ান্ত লড়াইয়ের উপযুক্ত সময় এসেছে বলে মনে করা চলে।" "বাস্তবিকপক্ষে তখনই বিপ্লবের সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত হয়েছে, তখন যদি উপরে বর্ণিত সমস্ত অবস্থার আমরা সঠিক হিসাব নিয়ে থাকি এবং সঠিক মুহূর্তটি বেছে নিয়ে থাকি নির্ভুলভাবে, তবে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।" (সিলেকটেড ওয়ার্কস, দশম খণ্ড।)

কিন্তু আঘাত হানার এই চরম মুহূর্তের পূর্বে আঘাত হানার অর্থ হলো বিপ্লবকে নিয়ে ছেলেখেলা করা, আবার এই চরম মুহূর্তে আঘাত হানতে দ্বিধা করার অর্থ হলো মৃত্যু।

বিপ্লবের এই মূলসূত্রই মূর্ত হয়ে উঠেছে লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত মহান নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যে। রুশদেশে ১৯১৭-এর মার্চ বিপ্লবে জারতন্ত্রের অবসান করা হয়েছিল এবং স্থাপিত হয়েছিল বুর্জোয়াদের অস্থায়ী সরকার। এই সরকারকে উচ্ছেদ করতে না পারলে যে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারবে না সেকথা লেনিন খুব ভালোভাবেই জানতেন। কিন্তু লেনিন তক্ষুনি সেই বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করার আহ্বান জানাননি। এপ্রিল মাসে লেনিন যে কর্মপন্থা রচনা করলেন তাতেও অবিলম্বে অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদের অর্থাৎ তক্ষুনি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের স্লোগান দেওয়া হলো না, স্লোগান দেওয়া হলো "অস্থায়ী সরকারকে কোনোরকম সমর্থন নয়।" এরকম করা হলো কেন? এরকম করা হলো এই জন্য যে তখনো মেহনতী জনগণের নিজস্ব রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের স্লোগান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের জীবনের স্লোগান হয়ে ওঠেনি। সুদীর্ঘ আটমাস ধরে—মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চলেছিল তীব্র রাজনৈতিক বিকাশের এক প্রক্রিয়া। তারপরেই নভেম্বর বিপ্লবে পূর্ণ হলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্য। মার্চ মাসে রুশদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা ছিল তাতে চরম আঘাত হানার মুহূর্ত তখনো আসেনি, সে মুহূর্ত এলো নভেম্বর মাসে।

কোন্ সময় কোন্ স্লোগান দিতে হয়, বিপ্লবের "পরিপ্রেক্ষিত" আর "আজকের দিনের স্লোগান" যে এক জিনিস নয় এবং এ দুটোকে এক করে দেখলে বিপ্লবেরই যে ক্ষতি হয় তা লেনিনের ঐ এপ্রিল কর্মপন্থার মধ্য দিয়ে

সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ ছাড়া, সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে আসা ছাড়া যে বিপ্লব সফল হতে পারবে না, তা তো ছিল স্বতঃসিদ্ধ। তবু লেনিন তাঁর এপ্রিল কর্মপন্থায় অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে তখনই বিদ্রোহের আহ্বান জানাননি। তিনি অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদও দাবি করলেন না। তিনি শুধু বললেন ঃ "অস্থায়ী সরকারের প্রতি কোন সমর্থন নয়।" সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলশেভিক পার্টিকে বললেন যে, এখনি অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে না, কেননা সেই সরকার তখনো সোভিয়েতগুলির আস্থাভাজন ছিল আর সোভিয়েতগুলিতে ছিল মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রাধান্য। তাই তিনি চাইলেন যে, জনগণকে সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে, মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের আসল চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন করে এবং জনগণের মধ্যে বলশেভিকদের সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি করে, সোভিয়েতগুলিতে অধিকাংশ আসন দখল করে সোভিয়েতগুলির কর্মপ্রণালী বদলানো হোক এবং ঐ সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে সরকারের গঠন ও কর্মপ্রণালী বদলানো হোক।

লেনিন বিপ্লবের "পরিপ্রেক্ষিতকে" বিপ্লবের "আজকের দিনে স্লোগান" হিসাবে জাহির করেননি। এপ্রিল কর্মপন্থার পরে মে মাসের গোড়ার দিকে এ কাজটি করেছিল বগদাতিয়েভের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাদের বলশেভিকদের ছোট একটি গ্রুপ। বগদাতিয়েভ তখনই অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদের স্লোগান তুলেছিলেন। লেনিন তখন বগদাতিয়েভের গ্রুপের কার্যকলাপকে বিপজ্জনক হঠকারিতা বলে অভিহিত করলেন এবং প্রকাশ্যে এর তীব্র সমালোচনা করলেন।

কিন্তু আট মাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণ যখন নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো এবং জনগণের সংখ্যাগুরু অংশ বলশেভিকদের দিকে এসে গেল তখন লেনিন ঘোষণা করলেন যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন এগিয়ে এসেছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের অনুকূল মুহূর্ত যদি উত্তীর্ণ হয়ে যায় তাহলে জনগণের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবের জয়ের পথ উন্মুক্ত হবে। লেনিন তখন বলশেভিক পার্টিকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, "বিলম্ব মানে মৃত্যু।"

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি চূড়ান্ত মুহূর্তে চরম আঘাত হেনে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলো, সার্থক হলো নভেম্বর বিপ্লব, দুনিয়ার বুকে স্থাপিত হলো প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

বিপ্লব ছাড়া যে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয় সে কথাই প্রমাণিত হলো নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। তারপরের যুগান্তকারী ঘটনা হলো চীনের বিপ্লব। সে বিপ্লবও দেখিয়ে দিল রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের

সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্যের পথ হলো বিপ্লব। একদল লোক বলছে যে পার্লামেণ্টারি পথেই শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে, বিপ্লবের কোনো প্রয়োজন নেই। এইসব ব্যক্তিরা আসলে মার্কসবাদকে বিকৃত করছে।

২২

সংশোধনবাদ

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কথাটাই হলো প্রধান এবং মূল কথা। এই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে বিপ্লবের পথে, সংসদীয় গণ-তন্ত্রের পথে এই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায় না। শ্রমিকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন মার্কস, এঙ্গেলস আর লেনিন।

শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি সর্বপ্রথমে বাস্তব রূপ ধারণ করেছিল ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনে। ফরাসী বুর্জোয়াদের আক্রমণে কমিউন টিকে থাকতে পারেনি, এর আয়ু ছিল মাত্র ৭২ দিন—১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে। প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণের ফলে কমিউনের পতনের দিন যখন ঘনিয়ে এলো তখন মার্কস বলেন ঃ "কমিউন যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে সংগ্রাম স্থগিত রাখা হবে মাত্র। কমিউনের মূলনীতিগুলি চিরকাল বিরাজ করবে এবং সেগুলির বিনাশ নেই ; শ্রমিকশ্রেণী মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি বারে বারে আত্মপ্রকাশ করবে।"

এই মূল নীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিষয়টি। কমিউনের মধ্যেই মার্কস ও এঙ্গেলস দেখতে পেয়েছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে। তারা সেদিন বলেছিলেন ঃ "কমিউন বিশেষভাবে একটি বিষয় দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রমিকশ্রেণী আগের তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেবল দখল করেই তার নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একে চালনা করতে পারে না।" বরং শ্রমিকদের "এই যন্ত্রটিকে ধ্বংস করতে হবে"—এই কথাই মার্কস লিখেছিলেন তাঁর বন্ধু কুগেলমানকে ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে অর্থাৎ ঠিক কমিউনের সময়ে।

শ্রমিকশ্রেণীকে তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে শুধু দখল করেই ক্ষান্ত থাকলে চলবে না ; শ্রমিকশ্রেণীকে ঐ যন্ত্রটি ভেঙে চুরমার করতে হবে, আর ওর জায়গায় স্থাপন করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র যা আবিষ্কৃত হলো কমিউনে। সেই রাষ্ট্রযন্ত্র হলো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।

প্যারি কমিউন সম্পর্কে মার্কসের এই শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন লেনিন এবং তাকে রুশদেশের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে লেনিন দেখালেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীকে বৈপ্লবিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, বুর্জোয়াদের সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটিকে ধ্বংস করতে হবে এবং বুর্জোয়া একনায়কত্বের জায়গায় সংস্থাপিত করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের শিক্ষার মূল কথা হলো যে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করতে হবে, বিপ্লবের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু যে সব দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়নি, সে সব দেশে শ্রমিকশ্রেণীকে এই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে হবে। লেনিন দেখালেন যে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একই শৃঙ্খলের দু'টি গ্রন্থি। ১৯০৫ সালেই রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক কর্তব্যের সুনির্দিষ্ট একটি রূপরেখা দিয়ে লেনিন লিখলেন :

"স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধকে বলপ্রয়োগে চূর্ণ করবার জন্য এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অনিশ্চিত মনোবৃত্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্য কৃষক-সাধারণের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে শ্রমিকশ্রেণীকেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পূর্ণ সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধকেও বলপ্রয়োগে চূর্ণ করবার জন্য এবং কৃষক সম্প্রদায় ও পেটিবুর্জোয়াদের অনিশ্চিত মনোবৃত্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্য ও জনগণের মধ্যে যারা আধা-প্রলেতারিয়েত তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে পূর্ণ সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এই হলো শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য…"

লেনিন-নির্দেশিত এই পথে চলেই রুশদেশের বলশেভিক পার্টি রুশ দেশে বিপ্লবকে সফল করতে পেরেছিল। বিপ্লবের পর এই সাফল্য সম্পর্কে লেনিন নিজেই লিখেছিলেন : "আমরা যা বলেছিলাম তাই সত্যি হয়েছে। বিপ্লবের গতি আমাদের যুক্তির নির্ভুলতা প্রমাণ করে দিয়েছে। প্রথমে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে আর মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'সমগ্র' কৃষক-সমাজকে সঙ্গে নিয়ে [এবং সে পর্যন্ত বিপ্লব বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে গণ্য হবে]; তারপরে গরিব কৃষক আর আধা-শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে, সমস্ত শোষিত জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, গ্রামের ধনী, ধনী-কৃষক, আর মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে এগুতে হবে; এবং এই অবস্থায় বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবে। প্রথম আর দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে কোনো কৃত্রিম চীনের প্রাচীর খাড়া করার চেষ্টা করা, শ্রমিকশ্রেণীর প্রস্তুতির

পরিমাণ, গরিব কৃষকদের সংগে তাদের ঐক্যের পরিমাণ ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়ে এই দুই বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানার চেষ্টা করার অর্থ মার্কসবাদকে জঘন্যভাবে বিকৃত করা, তার জায়গায় উদারনীতিবাদকে স্থান দেওয়া।” [লেনিন : প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি]।

অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীকে অগ্রসর হতে হবে বিপ্লবের পথে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করার পথেই অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ পথে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল করা আদৌ সম্ভব নয়। বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী কখনো স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না, দেবেও না। “দুনিয়ায় কোনো শাসকশ্রেণীই সংগ্রাম ছাড়া কোনোদিন পরাজয় স্বীকার করেনি” (লেনিন)। আর “সাধারণতঃ প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলিই প্রথমে হিংসার পথ, গৃহযুদ্ধের পথ গ্রহণ করে, তারাই প্রথমে বেয়নেট উঁচু করে আক্রমণ শুরু করে।” (লেনিন)

লেনিন মার্কসবাদীদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে : “ইতিহাসে গৃহযুদ্ধ ছাড়া কোনো বড় বিপ্লব আজ পর্যন্ত ঘটেনি এবং আদর্শে অটল কোনো মার্কসবাদীই এ কথা বিশ্বাস করবে না যে, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ গৃহযুদ্ধ ছাড়াই সম্ভব।”

তাই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মোহ মার্কসবাদীদের থাকতে পারে না। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে বিপ্লবের মাধ্যমে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এবং সে বিপ্লব হবে অশান্তিপূর্ণ এবং যন্ত্রণাদায়ক, ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত বিপ্লব ঘটেছে তাতে এই বিপ্লবের গতিপথই ঘোষিত হয়েছে।

কিন্তু আজকাল একদল লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে, মার্কসবাদী বলে জাহির করে, আর সংগে সংগে বলে বিপ্লবের আর প্রয়োজন নেই, “শান্তিপূর্ণ উপায়ে, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা আর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান”—এই তিন হাতিয়ারের দৌলতেই শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারবে ; এদের মধ্যে আবার আর একদল বলে যে, পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে, রাষ্ট্র-কাঠামোর সংস্কার সাধন করেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যাবে। আসলে এরা মার্কসবাদকে সংশোধন করতেই চায়। বর্তমান দুনিয়ায় এরা আধুনিক সংশোধনবাদী বলে খ্যাত। এদের আগেও একদল মার্কসবাদকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছে এবং তাদের মতবাদই বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

বিপ্লবের পথে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার পথে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার পথে, না, শান্তিপূর্ণ উপায়ে, পার্লামেন্টারি প্রথায় সমাজতন্ত্র আসবে ?—এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত রয়েছে মার্কসবাদ আর

সংশোধনবাদের পার্থক্য। মার্কস ও এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর এই প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে লেনিন মার্কসবাদকে বিকশিত করে তুললেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে মার্কস ও এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর কমিউনের মূল নীতিকে রক্ষা করার জন্য, সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে আপসহীন তীব্র সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল লেনিনকে।

কিন্তু সংশোধনবাদের আবির্ভাবের ইতিহাসটা কী এবং এর মূল কথাটাই বা কী?

সংশোধনবাদের স্রষ্টা হিসাবে যে-ব্যক্তি পরিচিত তাঁর নাম হচ্ছে বার্নস্টাইন। মার্কস-এঙ্গেলসের মতন এডওয়ার্ড বার্নস্টাইনেরও জন্মভূমি ছিল জার্মানি। বাইশ বছর বয়সে বার্নস্টাইন যোগ দিয়েছিলেন জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে। ১৮৭৮-৭৯ সালে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির তিনজন সদস্য—হোখবের্গে, বার্নস্টাইন ও সরাম জুরিখে একটি পত্রিকায় পার্টির আন্দোলনের সমালোচনা করে এবং পার্টির কিভাবে চলা উচিত, কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে এক প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধটি জুরিখত্রয়ী ইশ্তেহার নামে খ্যাত। এই তিন সদস্য তখন দাবি করেছিলেন যে, সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিকে "একপেশে শ্রমিকদের পার্টি হলে চলবে না," পার্টিকে "প্রকৃত মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমস্ত লোকদের সবপেশে পার্টি হতে হবে"; পার্টির নেতৃত্বের আসনে ও পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদের পদে "সম্পত্তিবান শ্রেণীর শিক্ষিত সদস্যদেরই" বসাতে হবে এবং "অতিরঞ্জিত আক্রমণের" দ্বারা বুর্জোয়াদের ভীত বা শত্রু করে তোলা চলবে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিবর্তে তাদের পার্টিতে "জয় করে আনতে হবে"।

মার্কস ও এঙ্গেলস জুরিখত্রয়ীর এই থিসিসের তীব্র সমালোচনা করলেন। পার্টির কাছে এক "সার্কুলার পত্রে" তাঁরা লিখলেন: "সংক্ষেপে এই ইশ্তেহারের মানে হলো—নিজের জোরে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীর নেই। এর জন্য তাকে শিক্ষিত ও সম্পত্তিবান বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন হতে হবে, কিসে শ্রমিকদের কল্যাণ হয়, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার মত সময় ও সুযোগ কেবলমাত্র তাদেরই আছে। দ্বিতীয়তঃ, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কোনক্রমেই লড়াই করা চলবে না। বরং জোরালো প্রচারকার্যের দ্বারা তাদের পক্ষে টেনে আনতে হবে। কিন্তু সমাজের উচ্চস্তরের কিংবা ঐ স্তরের মাত্র সদিচ্ছাপ্রণোদিত ব্যক্তিদের পক্ষে টেনে আনতে হলে তাদের ভীত করা চলবে না।"

মার্কস ও এঙ্গেলস এই সার্কুলার পত্রে দেখালেন যে, জুরিখের তিন বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম বর্জন করার কর্মসূচী গ্রহণের প্রচার আরম্ভ করেছে এবং তাঁরা সুস্পষ্ট ভাষায় এই কথা ঘোষণা করলেন যে, "যাঁরা আন্দোলন থেকে শ্রেণী-

সংগ্রামকে বর্জন করতে চান, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।"

জুরিখত্রয়ীর থিসিসের মূল কথাই বার্নস্টাইন নয়া তত্ত্ব হিসাবে বিকশিত করলেন ১৮৯৫ সালের পরবর্তীকালে, অর্থাৎ এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর। জার্মানিতে সোস্যালিস্ট-বিরোধী আইন পাশ হবার পর বার্নস্টাইন জার্মানি ত্যাগ করে লন্ডনে চলে আসেন। এখানেই ব্রিটেনের ফ্যাবিয়ান সোস্যালিস্টদের প্রচণ্ড প্রভাব তাঁর উপর পড়ে। এই লন্ডনে বসেই তিনি মার্কসবাদের সমালোচনা লিখতে আরম্ভ করেন। এঙ্গেলস যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বিশেষ কোনো সমালোচনা লেখার সাহস তাঁর হয়নি। এঙ্গেলস মারা গেলেন ১৮৯৫ সালে। তারপর থেকেই শুরু হলো বার্নস্টাইনের নতুন থিওরি রচনার ও তার প্রচারের অভিযান। তাঁর থিওরি পূর্ণ রূপ গ্রহণ করল ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর "বিবর্তনের পথে সমাজতন্ত্র" (Evolutionary Socialism) নামক গ্রন্থে। ১৮৯৯ সালে হ্যানোভারে অনুষ্ঠিত জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি কংগ্রেসে তিন দিন ধরে তাঁর এই নতুন থিওরি আলোচিত হয় কিন্তু কংগ্রেস এই থিওরি 'গ্রহণ' করতে অস্বীকার করে।

১৯০০ সালে বার্নস্টাইন ফিরে আসেন জার্মানিতে এবং সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি নিজের মত প্রচার করতে থাকেন। তাঁর সেই মতবাদই সংশোধনবাদ নামে খ্যাত। তিনি বললেন যে, মার্কসের সমস্ত বক্তব্য এখন প্রযোজ্য নয়, তাই কালোপযোগী করে তিনি মার্কসবাদের সংশোধন করেছেন।

১৯০০ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন পর্যন্ত সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত মার্কসবাদীদের প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সংগ্রামের গোড়ার দিকে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা কার্ল কাউৎস্কি মার্কসবাদের পক্ষ সমর্থন করে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে—লেনিনের কথায় কাউৎস্কি তখন পর্যন্তও বিপ্লবী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে কাউৎস্কি সংশোধনবাদীদের দলে ভিড়ে যান এবং সংশোধনবাদের অন্যতম প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব লেনিনকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ইতিহাসের গতিধারায় মার্কসবাদের সত্যতা যখন সপ্রমাণিত হলো, যখন ইউরোপ ও আমেরিকার প্রলেতারিয়েত "একক বাহিনীরূপে, এক পতাকার নীচে, একটি উপস্থিত লক্ষ্য নিয়ে" সংঘবদ্ধ হলো, যখন তত্ত্বগতভাবে মার্কসবাদের জয়ধ্বনিই দিকে দিকে ঘোষিত হলো, তখন মার্কসবাদের শত্রুরা দেখলো যে,

প্রকাশ্যে মার্কসবাদের বিরোধিতা করে বিশেষ ফল পাওয়া যাবে না, মার্কসবাদী সেজেই মার্কসবাদের বিরোধিতা করতে হবে, শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির অভ্যন্তরে থেকেই এই বিরোধিতাই আত্মপ্রকাশ করলো মার্কসবাদকে সংশোধন করার রূপ নিয়ে।

লেনিনের কথায় ঃ

সংশোধনবাদ বা মার্কসবাদের 'সংশোধন' হচ্ছে প্রলেতারিয়েতের উপর বুর্জোয়া প্রভাবের এবং শ্রমিকদের কলুষিত করার বুর্জোয়া পদ্ধতির প্রধান অভিব্যক্তি না হলেও অন্যতম প্রধান অভিব্যক্তি। সে জন্যই সুবিধাবাদী নেতা এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন এতো বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন।" [হঠকারী সিদ্ধান্ত —১৯১৪]

বার্নস্টাইনের রাজনৈতিক বক্তব্যের মূল কথা হলো যে, সোস্যাল ডেমোক্রাসিকে (শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে) সমাজ-বিপ্লবের পার্টি থেকে সমাজ সংস্কারের গণতান্ত্রিক পার্টিতে রূপান্তরিত হতে হবে। এই বক্তব্য সঠিক বলে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বার্নস্টাইন নতুন যুক্তির অবতারণা করলেন। সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার সম্ভাবনা তিনি অস্বীকার করলেন। সমাজতন্ত্র যে দরকার এবং অবশ্যম্ভাবী তা ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ করবার সম্ভাবনা তিনি অস্বীকার করলেন। ধনতন্ত্রের বিকাশের সংগে সংগে যে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ছে এবং সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, আর ওদিকে যে ধনিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠছে তা তিনি অস্বীকার করলেন। তাঁর মতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের "চরম লক্ষ্য" বলে কিছু নেই—"চরম লক্ষ্য" হলো অবাস্তব কথা। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণাকে তিনি সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন। শ্রেণী-সংগ্রামের তত্বকে তিনি এই বলে বাতিল করে দিলেন যে, জনসংখ্যার অধিকাংশের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত কোনো গণতান্ত্রিক সমাজেই এ তত্ব প্রয়োগ করা যায় না।

"আন্দোলনই সব কিছু, চরম লক্ষ্য কিছুই নয়"—বার্নস্টাইনের এই কথার মধ্যেই সংশোধনবাদের সার কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেনিন তাই বলেছিলেন ঃ

সংশোধনবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদের একটা স্বাভাবিক পরিপূরক হলো সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের চরম লক্ষ্যের প্রতি তার মনোভাব। "আন্দোলনই সব কিছু, চরম লক্ষ্য কিছুই নয়"—বার্নস্টাইনের এই সর্বজন-বিদিত উক্তি অনেক দীর্ঘ যুক্তির চাইতে অনেক ভালোভাবে সংশোধনবাদের সারবস্তুকে প্রকাশ করেছে। এক একটি ঘটনা থেকে আচরণ নির্ধারণ করা

সমসাময়িক ঘটনাসমূহের সঙ্গে এবং ক্ষুদ্র রাজনীতির ক্রমাগত পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক স্বার্থ, সামগ্রিকভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ধনতন্ত্রের বিবর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে ভুলে যাওয়া, প্রকৃত বা আনুমানিক আশু সুবিধার বদলে এই সব মৌলিক স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া—এই হল সংশোধনবাদের কর্মনীতি। এই কর্মনীতির প্রকৃতি থেকেই সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে যে, সংশোধনবাদ অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করতে পারে এবং মোটামুটিভাবে "প্রতিটি নতুন" প্রশ্ন, প্রতিটি ঘটনার কম বেশি অপ্রত্যাশিত এবং অচিন্ত্যপূর্ব গতি পরিবর্তন, যদিও তা কেবল নগণ্য মাত্রায় এবং তাও ন্যূনতম সময়ের জন্য বিকাশের মূল গতিপথের পরিবর্তন আনে, তা হলেও সব সময় তা থেকে অনিবার্যরূপে কোন না কোন প্রকারের সংশোধনবাদের উদ্ভব ঘটবে।" [মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ]

দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের মূল কথা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকেই সংশোধনবাদীরা অস্বীকার করে। তারা অনুসরণ করে আধুনিক কান্টবাদীদের। লেনিনের কথায়ঃ "'কৌশলী' (এবং বিপ্লবী) ডায়েলেকটিসের জায়গায় এরা বসায় 'সাধারণ' (এবং শান্ত) বিবর্তনকে।"

অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংশোধনবাদীরা মার্কসীয় অর্থনীতিকেই "সংশোধন" করার চেষ্টা করেছে—তারা আশা করেছিল যে ধনতন্ত্রের এক নতুন শান্তিপূর্ণ যুগ শুরু হবে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে সংশোধনবাদীরা অস্বীকার করে শ্রেণীসংগ্রামকে, বাতিল করে দেয় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের থিওরিকে এবং তারা শ্রেণীসহযোগিতার নীতিই প্রচার করে।

লেনিনের কথায়ঃ "রাজনীতির ক্ষেত্রে সংশোধনবাদ মার্কসবাদের ভিত্তি-মূল অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদকে প্রকৃতই সংশোধন করার চেষ্টা করেছে। আমাদের বলা হয়ে থাকে যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর সর্বজনীন ভোটাধিকার শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিকে অপসারিত করছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর কোনো দেশ নেই, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর এই পুরানো বক্তব্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেছে। এঁরা বলেছিলেন, যেহেতু গণতন্ত্রে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই' বলবৎ থাকে, সেই হেতু রাষ্ট্রকে শ্রেণীশাসনের যন্ত্র হিসাবে গণ্য করাও যেমন চলবে না, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল, সমাজ-সংস্কারক বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীকেও বর্জন করা চলবে না।" [মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ]

সংশোধনবাদীরা দাসসুলভ মনোভাব নিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পূজা করে থাকে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ক'রে তারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার সুখ-স্বপ্ন দেখে।

"মার্কসের শিক্ষাকে বিদ্রূপ করে এই সব ভদ্রলোকেরা, কাউত্স্কিপন্থী-সমেত সুবিধাবাদীরা জনসাধারণকে এই শিক্ষাই দিতে চায় যেঃ সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রলেতারিয়েতকে প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে হবে, পরে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে পেতে হবে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং শুধু তারই পরে 'সামঞ্জস্যপূর্ণ' (অন্য কথায় 'বিশুদ্ধ') গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে সমাজতন্ত্র।

"কিন্তু আমরা মার্কসের শিক্ষা আর রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলি ঃ প্রলেতারিয়েতকে প্রথমে বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং নিজের জন্য জয় করে নিতে হবে রাষ্ট্রক্ষমতা, এবং তারপরে সেই রাষ্ট্রক্ষমতাকে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে ব্যবহার করতে হবে, ব্যবহার করতে হবে মেহনতী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সহানুভূতি জয় করবার উদ্দেশ্যে নিজ শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবে।"

[লেনিন ঃ সংবিধান সভার নির্বাচন ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯১৯]

বিপ্লবের মাধ্যমে বলপ্রয়োগ ক'রে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাই যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মৌলিক কথা তা সংশোধনবাদীরা অস্বীকার করে। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে, সংস্কার সাধনের পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথাই তারা জোর গলায় প্রচার করে থাকে।

এদের বিদ্রূপ করে লেনিন বলেছিলেন ঃ "এখন এই সব লোকেরা আমাদের বলছে, 'সমাজতন্ত্র হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা'। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা তো অনেক বই পড়েছেন, অনেক বই লিখেছেন এবং ঐ সব বইয়ের আপনারা কিছুই বোঝেন নি।

"যে ধনতন্ত্রী সমাজ শান্তিপূর্ণ উপায়ে শান্তির সময়ে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে সেই রকম একটি ধনতন্ত্রী সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অবশ্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেয়ে আর কোন জরুরী কাজ থাকতে পারে না। শুধু ছোট্ট একটি কথা বলতে হবে ঃ সেটি হলো একটি 'যদি'। যদি এইভাবে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটতো, সমাজতন্ত্রের এই রকম আবির্ভাব ঘটতে দিতে ধনিক ভদ্রলোকেরা সম্মত হতেন না। সুতরাং এই বক্তব্যের মধ্যে কিছু একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। এমন কি যদি কোনো যুদ্ধও না ঘটতো তা হলেও ধনিক ভদ্রলোকেরা ওরকম শান্তিপূর্ণ বিকাশকে প্রতিহত করবার জন্য সবকিছুই করতেন। বিরাট বিরাট বিপ্লবের, এমন কি মহান ফরাসী বিপ্লবের মতন যখন সেগুলি শান্তিপূর্ণভাবেই আরম্ভ হয়েছে তখন তাদের অবসান ঘটেছে প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে, যে যুদ্ধ প্রতিবিপ্লবী

বুর্জোয়ারাই শুরু করেছে। স্বাধীনতা, সমানাধিকার, শ্রমিক গণতন্ত্র এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা সম্বন্ধে অর্বাচীনদের বড় বড় কথার দৃষ্টিকোণ থেকে বা মেনশেভিক, এস আর এবং সমস্ত 'ডেমোক্রাটরা' যে সব অর্থহীন অবাস্তব বড় বড় কথা আমাদের উপর প্রয়োগ করেছে সেই সব কথার দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নটিকে বিচার না করে যদি একে আমরা শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তা হলে এ ছাড়া কিছুই হতে পারে না। শান্তিপূর্ণ বিকাশের পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো যেতে পারে না।" ["স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের স্লোগান দিয়ে জনসাধারণকে প্রতারণা করা"—মে, ১৯১৯]

আসলে সংশোধনবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে বুর্জোয়া প্রভাবেরই প্রতিচ্ছবি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত যে যুগ চলেছিল সে যুগকে শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে তথাকথিত "শান্তিপূর্ণ" যুগ বলা হয়ে থাকে। এই যুগ শ্রমিকদের শিখিয়েছিল পার্লামেন্টারি প্রথার মতন গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের হাতিয়ারকে এবং সর্বপ্রকার আইনসংগত কাজকর্মের সুযোগ সুবিধাকে ব্যবহার করতে, শ্রমিকদের শিখিয়েছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে, নিজেদের পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে। অন্যদিকে আবার এই যুগেই শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এক অদ্ভুত ধরনের ঝোঁক—সে ঝোঁক হলো শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করবার, সামাজিক শান্তির বাণী প্রচার করবার—সমাজতন্ত্রী বিপ্লবকে বাতিল করবার, বে-আইনী পার্টি সংগঠনের মূল নীতিকে অস্বীকার করবার, বুর্জোয়া দেশপ্রেমকে স্বীকার করে নেওয়ার ঝোঁক। এই ঝোঁকের প্রতিভূ ছিল কারা? উপনিবেশ থেকে লুটে আনা মুনাফার ছিটেফোঁটা দিয়েই সাম্রাজ্যবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি করেছিল একটি শ্রমিক অভিজাত সম্প্রদায়। আর ওদিকে সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে পেটিবুর্জোয়া দরদীদের অনুপ্রবেশও ঘটেছিল, এই শ্রমিক অভিজাত সম্প্রদায় ও পেটিবুর্জোয়া দরদীরাই ছিল এই ঝোঁকের প্রতিভূ এবং তারাই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিয়ে এসেছিল বুর্জোয়া প্রভাব। এরাই হলো সংশোধনবাদের প্রধান পান্ডা। প্রকৃতপক্ষে এরা হলো বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি রাজনৈতিক বাহিনী বিশেষ—এরা বুর্জোয়া ভাবধারার বাহক। শ্রমিক আন্দোলনের এরা বুর্জোয়াদেরই এজেন্ট। শান্তির সময় এরা শ্রমিকদের পার্টির মধ্যে থেকেই বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষার কাজ চালিয়ে যায় নানারূপ অপরূপ তত্ত্বকথার দোহাই দিয়ে, কিন্তু যখন সংকট দেখা দেয় তখন তারা শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে একটুও দেরী করে না। কালবিলম্ব না করেই এরা সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীরই পক্ষ সমর্থন করতে আরম্ভ করে। দেশপ্রেমের নামে এরা যুদ্ধের সময় বুর্জোয়া সরকারেরই সমর্থক হয়ে ওঠে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে

বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত করবার জন্য তারা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে থাকে। তারা বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রগতিশীল অংশ আবিষ্কার করে সেই অংশের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীকে বেঁধে দিতেই চায়। আসলে এরা হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোয়া-শত্রু।

বুর্জোয়ারা বেশ ভালভাবেই বোঝে যে নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য তাদের পক্ষে সংশোধনবাদী-দের ব্যবহার করাই সবচেয়ে শ্রেয় এবং সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক। কারণ সংশোধন-বাদীরা জনসাধারণের সামনে সংস্কারের পথে মুক্তির এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্রই তুলে ধরে, তারা জনসাধারণের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে সংস্কারের পথে নিয়ে যাবারই চেষ্টা করে।

সংক্ষেপে এই হলো সংশোধনবাদের মূল কথা। দেশে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির পথে এটি প্রতিবন্ধ বিশেষ। বর্তমান জগতে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই সংশোধনবাদই দেখা দিয়েছে নতুন নামে—আধুনিক সংশোধনবাদ রূপে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব আধুনিক সংশোধনবাদেরই নেতা—তারা বলছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন আর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন নেই, আর সোভিয়েত রাষ্ট্র হচ্ছে জন-রাষ্ট্র। এই আধুনিক সংশোধনবাদের নেতা হিসাবেই নিকিতা ক্রুশ্চেভ যে তত্ত্ব হাজির করেছিলেন তার মূল কথা হলো যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্রে পেঁছানো যাবে, বিপ্লবের আর প্রয়োজন নেই। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা তোগলিয়াত্তি প্রচার করলেন পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে পেঁছানোর বাণী—তিনি জাহির করলেন রাষ্ট্রকাঠামোকে সংস্কার করে সমাজতন্ত্রে পেঁছাবার তত্ত্বকথা।

২৩

সংকীর্ণতাবাদ

সংশোধনবাদ কথাটির মতন সংকীর্ণতাবাদ কথাটির সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। সংশোধনবাদ আর সংকীর্ণতাবাদ উভয়েই মার্কসবাদকে বিকৃত করে। সংশোধনবাদ মার্কসবাদকে যুগোপযোগী, কালোপযোগী করার নামে মার্কস-বাদের মূল নীতিকে বিকৃত করে, অস্বীকার করে মার্কসবাদের প্রাণবস্তুকে—শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব আর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে। অন্যদিকে

সংকীর্ণতাবাদ মার্কসবাদকে আপ্তবাক্য মনে করে, সূত্রানুবন্ধ বিধি বা অন্ধ বিশ্বাসের প্রতীক বলে মনে করে। যেহেতু মার্কসবাদের লক্ষ্য বিপ্লব, সেহেতু সংকীর্ণতাবাদীরা মার্কসবাদের আক্ষরিক বিশুদ্ধতার কথা বলে স্থান-কাল-পাত্র বিচার না করে সর্বক্ষণই বিপ্লবের স্লোগান আউড়ে চলে—এরা রেডিমেড বিপ্লবের ভক্ত, এরা চায় "এক্ষুনি, এই মুহূর্তে বিপ্লব করতে হবে"; এরা মার্কসবাদকে কর্মক্ষেত্রে পথনির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে আপ্তবাক্য হিসাবে। তাই সব সময়েই এরা অতিবিপ্লবী, "হঠাৎ ক্ষেপে-ওঠা" বিপ্লবী।

এই "হঠাৎ ক্ষেপে-ওঠা" বিপ্লবীদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৮৫০ সালে কমিউনিস্ট লীগের সভায় মার্কস বলেছিলেন: "এঁরা বাস্তব অবস্থার পরিবর্তে নিছক অভিলাষকেই বিপ্লবের ক্রিয়াশক্তি হিসাবে মনে ক'রে থাকেন।" আমরা যখন শ্রমিকদের বলি: 'কেবলমাত্র তোমাদের অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য নয়, তোমাদের নিজেদের পরিবর্তন করার জন্য এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য নিজেদের যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে তোমাদের পনেরো, কুড়ি, পঞ্চাশ বছরের গৃহযুদ্ধ ও জাতীয় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তখন এঁরা তাদের বিপরীত কথা বলেন: "অবিলম্বে আমাদের ক্ষমতা দখল করতে হবে, অন্যথায় আমরা শুয়ে পড়তে পারি এবং ঘুমুতে যেতে পারি।" আমরা যখন জার্মান প্রলেতারিয়েতের অপরিণত প্রতিকৃতিটি জার্মান শ্রমিকদের সামনে বিশেষভাবে তুলে ধরি, তখন এঁরা একেবারে খোলাখুলিভাবেই জার্মান কারিগরদের জাতীয় মনোভাবের ও পেশাগত কুসংস্কারের স্তাবকতা করেন, অবশ্য এটা করা অনেক বেশি জনপ্রিয়। গণতন্ত্রীরা (ডেমোক্রাটস) যেমন "জনসাধারণ" শব্দটিকে এক পবিত্র সত্তায় রূপান্তরিত করেছিল, ঠিক তেমনি এঁরা করেছেন "প্রলেতারিয়েত" শব্দটিকে। গণতন্ত্রীদের মতনই এঁরা বিপ্লবী বিকাশের জায়গায় বিপ্লবী বুলিকে প্রতিস্থাপিত করেছেন।

এঙ্গেলস এই "হঠাৎ ক্ষেপে-ওঠা" বিপ্লবীদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন ব্লাঙ্কি-পন্থীদের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী দেশে দেখা দিয়েছিলেন লুই ব্লাঙ্কি আর তাঁর অনুচরবৃন্দ। এঁরা ছিলেন দিকে দিকে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে যাবার উগ্র প্রচারক, কোনোরকম নমনীয় রণকৌশলের এঁরা ছিলেন তীব্র বিরোধী। "আপস নাই, আপস নাই" বলে এঁরা চিৎকার করতেন। এঁদের বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াই চালাতে হয়েছিল মার্কস ও এঙ্গেলসকে। তেত্রিশজন ব্লাঙ্কিপন্থী কমিউনার্ডের ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা করে ১৮৭৪ সালে এঙ্গেলস লিখেছিলেন:

"ব্লাঙ্কিপন্থী, কমিউনার্ডরা তাঁদের ঘোষণাপত্রে লিখেছেন, আমরা কমিউনিস্ট, কারণ আমরা মাঝপথে কোথাও না থেমে, কোনো আপস না ক'রে আমাদের

লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই—এ সব আপস বিজয়ের দিনটিকেই শুধু স্থগিত রেখে প্রলম্বিত করে দাসত্বের যুগ।

"জার্মান কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট, কারণ তাদের হাতে গড়া নয়; বরং ঐতিহাসিক বিকাশের গতিপথে সৃষ্ট সমস্ত মধ্যবর্তী অবস্থান ও সকল আপস-রফা ভেদ ক'রে পরিষ্কার ভাবে তারা চূড়ান্ত লক্ষ্যটিকে দেখতে পায় এবং নিরন্তর তার অনুসরণ করে ; সে লক্ষ্য হলো সমস্ত শ্রেণীর বিলোপ সাধন এবং এমন এক নতুন সমাজের সৃষ্টি, যেখানে জমি অথবা উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানা আর থাকবে না। ওদিকে ঐ তেত্রিশজন ব্লাঙ্কিপন্থীও কমিউনিস্ট, কারণ তারা কল্পনা করে যে, মধ্যবর্তী অবস্থান এবং আপসগুলি তারা ডিঙিয়ে যেতে চায় বলেই বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়ে গেল, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে যদি 'এটা শুরু হয়' -হবে এটা যেন নিশ্চিত—তারা একবার যদি কাণ্ডারী হয়ে বসে তা হলে পরের দিন থেকে 'কমিউনিজম' প্রবর্তিত হবে। এ যদি অচিরে সম্ভব না হয় তবে তারা কমিউনিস্ট নয়।"

"ধৈর্যের অভাবটাকে তত্ত্বগতভাবে প্রত্যয়সিদ্ধ যুক্তি হিসাবে উপস্থিত করার শিশু-সুলভ অজ্ঞতারই কী অপূর্ব নিদর্শন!"

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বক্তব্যের মধ্য থেকে সংকীর্ণতাবাদের রূপটাই উদ্ঘাটিত হচ্ছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বাস্তব অবস্থার পরিবর্তে নিছক অভিলাষ, অবস্থার বিপ্লবী বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখার পরিবর্তে শুধু মুখে বিপ্লবী বুলি আওড়ানো, আর ধৈর্যের অভাব এবং সেই ধৈর্যের অভাবটা তত্ত্বগতভাবে প্রত্যয়সিদ্ধ যুক্তি হিসাবে উপস্থিত করার শিশু-সুলভ বাসনা—এই হচ্ছে সংকীর্ণতাবাদের প্রকৃত রূপ।

নিছক অভিলাষ, বিপ্লবী বুলি, ধৈর্যের অভাব—এই ত্র্যহস্পর্শযোগে সংকীর্ণতাবাদীরা বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণের ধার ধারে না। তাদের কাছে সর্ব ক্ষেত্রে এবং সর্ব সময়ে "সিচুয়েশন ফার্স্ট ক্লাস, সিচুয়েশন এক্সেলেন্ট"। তারা বিপ্লবের সোজা রাস্তা খোঁজে এবং নিজেদের সাচ্চা বিপ্লবী বলে জাহির করে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট বলে প্রতি দেশেই এদের আবির্ভাব ঘটে। আমাদের দেশেও এদের আবির্ভাব ঘটেছে নকশালপন্থীরূপে। এরা লেনিনের শিক্ষাকেই অস্বীকার করে। লেনিন কমিউনিস্টদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণই হচ্ছে মার্কসবাদের প্রাণস্বরূপ। সংকীর্ণতাবাদীরা কষ্ট সহকারে, ধৈর্য সহকারে বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা করতে নারাজ। এতো সময় নাকি তাদের নেই। তাই তারা বিপ্লবী বুলি আউড়েই সব সময় কিস্তিমাত করতে চায়। আমাদের দেশে বর্তমানে এই সংকীর্ণতাবাদের যে বিপ্লবী (!)

রূপটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি তাতে এদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, শহরের গৃহচূড়া থেকে "কৃষি-বিপ্লব চাই", "কৃষি-বিপ্লব চাই" বলেই এরা বিপ্লবের বন্যা বহাতে চায়, শহরের প্রাচীর গাত্রে স্লোগান লিখেই এরা কৃষি বিপ্লব সমাধা করতে চায়। এদের মুখে একটি মাত্র কথা ঃ "বিপ্লবের পরিস্থিতি বিরাজমান, দিকে দিকে এসেছে বিপ্লবের জোয়ার, এক্ষুনি শুরু করো বিপ্লব।"

কিন্তু বিপ্লবের পরিস্থিতি, বিপ্লবী অবস্থা বলতে কী বোঝায়, তা এরা জানে না। তারা জানে না বিপ্লবের মূলসূত্র কী?

মনে রাখা দরকার যে পুরানো সরকারের পতন ঘটাবার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির। ধনিকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার যোগ্য হতে হবে এই পার্টিকে। গোটা সমাজের রূপান্তর সাধনের প্রকৃত যোগ্য হতে হবে শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিকে। শুধু শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গেই নয়, অ-শ্রমিক মেহনতী জনগণের সঙ্গেও, এক কথায় জনগণের ব্যাপকতম সমষ্টির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতে হবে পার্টিকে। পার্টিকে বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এমন নীতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে যার নির্ভুলতা সম্বন্ধে জনগণ তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্থির নিশ্চিত হবে। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বের এই হলো বৈশিষ্ট্য। লেনিন বিষয়ীগত (সাবজেকটিভ) পরিবর্তন বলতে পার্টির এই সক্ষমতার উপরই জোর দিয়েছেন।

লেনিনের এই শিক্ষা সংকীর্ণতাবাদীরা উপেক্ষা করেই চলে। কোন্ বিপ্লবী অবস্থায় বিপ্লব হয় এবং বিপ্লবকে সার্থক করার জন্য কি কি প্রয়োজন এবং বিপ্লবকে সফল করার জন্য কিভাবে পার্টি গড়তে হবে, সে সম্বন্ধে লেনিনের উপরে বর্ণিত শিক্ষাকে সংকীর্ণতাবাদীরা পরিহার করেই চলে।

সংকীর্ণতাবাদের পঙ্কে যারা নিমজ্জিত তারা কখনোই একথা বুঝবে না এবং বুঝতে পারে না যে, শ্রমিকশ্রেণীর উপর, মেহনতী জনগণের উপর কমিউ-নিস্ট পার্টির নেতৃত্ব আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, জনগণের আস্থা অর্জন করতে হয়। জনগণের গণ-সংগঠনের দৈনন্দিন কাজে, তাদের প্রতিটি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে এবং এই কাজ ও সংগ্রামের সঠিক নীতি নির্ধারণ করেই জন-আস্থা অর্জন করতে হয়, কমিউনিস্টদের অগ্রণী ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এ কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব হতে পারে যদি আমাদের কাজের মধ্যে আমরা—কমিউনিস্টরা জনগণের শ্রেণী-সচেতনতার বর্তমান প্রকৃত স্তরটা, তাদের বৈপ্লবিক চেতনা কি পরিমাণে জাগ্রত হয়েছে তা বিচার করে দেখে আমাদের কর্মপন্থা স্থির করি, যদি আমরা আমাদের নিছক অভিলাষের ভিত্তিতে নয়, বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতেই বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করি। ধৈর্যসহকারে ধাপে ধাপে

ব্যাপক জনগণকে কমিউনিস্ট কর্মপন্থার দিকেই নিয়ে আসতে হবে—এটাই হলো কমিউনিস্টদের কর্তব্য। বড় বড় বিপ্লবী বুলি আউড়ে, লাফ দিয়ে পাহাড় ডিঙাবার কসরত করে এ কর্তব্য সম্পন্ন করা যেতে পারে না। কিন্তু সংকীর্ণতাবাদীরা এ কথায় কর্ণপাত করে না। এই সম্পর্কে লেনিন তাঁর "বামপন্থী কমিউনিজম—শিশু-সুলভ বিশৃংখলা" গ্রন্থে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা সব সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন। জার্মান 'বামপন্থীদের' অর্থাৎ সংকীর্ণতাবাদীদের সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন: "আসল কথা হলো—আমাদের কাছে যা অচল তাকে শ্রেণীর পক্ষে অচল, জনসাধারণের পক্ষে অচল বলে ভাবা কিছুতেই চলবে না।...'বামপন্থীরা' জানে না কিভাবে শ্রেণীর পার্টি হিসাবে, জনসাধারণের পার্টি হিসাবে বিচার করতে হয়, কাজ করতে হয়। জনসাধারণের স্তরে, শ্রেণীর পশ্চাৎপদ অংশের স্তরে আমাদের নেমে এলে চলবে না—এ বিষয়ে কোনো মতভেদই থাকতে পারে না। তাদের অতি তিক্ত সত্য শোনাতে হবে। তাদের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী কুসংস্কারকে কুসংস্কারই বলতে হবে। কিন্তু সেই সংগে বিশেষ বিবেচনার সংগে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে সমগ্র শ্রেণীর [শুধু এর অগ্রগামী কমিউনিস্টদের নয়], সমগ্র মেহনতী জনগণের [কেবল তাদের অগ্রগামী অংশের নয়] শ্রেণীচেতনা ও প্রস্তুতির প্রকৃত অবস্থাকে।"

মেহনতী জনগণের ব্যাপক অংশকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অগ্রণী বাহিনীর দিকে, কমিউনিস্ট পার্টির দিকে টেনে নিয়ে আসতে না পারলে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। মেহনতী জনগণের ব্যাপক অংশকে কমিউনিস্ট কর্মপন্থার দিকে নিয়ে আসাটাই যখন প্রধান কথা তখন এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ কর্তব্য সুসম্পন্ন করার জন্য "প্রচারাভিযানই [প্রোপাগাণ্ডা ও অ্যাজিটেশন] যথেষ্ট নয়—এর জন্য চাই জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা।" বিপ্লবের মূল সূত্র ব্যাখ্যা প্রসংগে এই কথাই বলেছিলেন লেনিন। শুধু প্রচারাভিযান, কৃষি বিপ্লবের রণধ্বনি দিয়ে জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব পূরণ করা যায় না। কিন্তু সংকীর্ণতাবাদীরা জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কোন মূল্যই দেয় না, তাদের কাছে প্রচারাভিযান আর বিপ্লবী বুলিই সব। যখনই তারা দেখে যে, রাজনৈতিক সংকট শুরু হয়েছে তখনই তাদেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তারা মনে করে যে, কমিউনিস্ট নেতাদের কাজ হচ্ছে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের স্লোগান দেওয়া, আর একবার স্লোগান দিতে পারলেই জনগণ সারিবদ্ধভাবে তাদের অনুসরণ করবে এবং বিপ্লব শুরু করে দেবে। সংকীর্ণতাবাদের এই হচ্ছে চরিত্র। নকশালপন্থীদের মধ্যে এই চরিত্রই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর আমাদের পার্টির "নতুন পরিস্থিতি ও

পার্টির কর্তব্য” শীর্ষক দলিলে এই কথাই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, দেশের অর্থনৈতিক সংকট দিনের পর দিন গভীরতর হচ্ছে এবং রাজনৈতিক সংকটের সূচনা হয়েছে এবং এই রাজনৈতিক সংকটের স্তরটা হচ্ছে প্রাথমিক স্তর। কিন্তু নকশালপন্থীরূপী সংকীর্ণতাবাদীরা বলছে যে, দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং এই বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপই গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের মতে জনসাধারণ ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন, আবেদন নিবেদন, পার্লামেন্টারি নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রভৃতি সংগ্রামী রূপ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে, তারা এখন সংগ্রামের সর্বোচ্চ বিপ্লবী রূপ গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। তাই তাঁদের মুখে সশস্ত্র সংগ্রামের রণধ্বনিই শোনা যাচ্ছে, তাই প্রাচীর গাত্রে তারা লিখছে: বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় তাদের রণধ্বনি ছিল: নির্বাচন বয়কট করো। পার্লামেন্টারি কাজকে তারা সংশোধনবাদী কাজ বলেই মনে করে। এটা সংকীর্ণতাবাদীদের ব্যাধি বিশেষ।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কমিউনিস্টরা—প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা পার্লামেন্টারি সংগ্রামের বিরোধী নয়, তারা এই সংগ্রামকে ব্যবহার করার পক্ষে, কিন্তু তারা বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট সম্পর্কে কোন রকম মোহ বিস্তারের বিরুদ্ধে। পার্লামেণ্টই সব এবং সব অবস্থায়ই পার্লামেন্টারি সংগ্রাম হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের একমাত্র বা প্রধান রূপ, এই ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী হলো কমিউনিস্টরা। এই প্রসঙ্গে লেনিনের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন: “শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি পার্লামেন্টারি সংগ্রামকে ব্যবহার করার, পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণ করারই সপক্ষে। কিন্তু তারা ‘পার্লামেন্টারি ক্রেটিনিজম’-এর অর্থাৎ পার্লামেন্টারি সংগ্রামই হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রামের একমাত্র বা সর্বাবস্থায়ই প্রধান রূপ, এই বিশ্বাসের স্বরূপ নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত ক’রে দেয়।”

[“পার্লামেন্টারি ক্রেটিনিজম” কথাটি মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখায় প্রায়ই দেখা যায়। “জার্মানিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব” নামক রচনায় এঙ্গেলস লিখেছিলেন: “পার্লামেন্টারি ক্রেটিনিজম হলো চিকিৎসাতীত এক রোগ, এক ব্যাধি যার দুর্ভাগ্য শিকারেরা এই সোল্লাস বিশ্বাসে আচ্ছন্ন যেন গোটা বিশ্ব, তার ইতিহাস, তার ভবিষ্যৎ গতি নির্ধারিত হচ্ছে ঠিক সেই প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য ভোটে, যে প্রতিষ্ঠানটি তাদের সভ্য হিসাবে পেয়ে সম্মানিত হবার সুযোগ পেয়েছে।”]

লেনিন পার্লামেন্টারি ক্রেটিনিজমকে তীব্র কষাঘাত করেছেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে,

নীতি হিসাবে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে বয়কট করা চলবে না, যেখানেই সম্ভব সেগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে শক্তিশালী করার কাজে, সেগুলির শ্রেণীচরিত্র উদ্ঘাটন করার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে, পার্লামেণ্টারি কাজকে মূল আন্দোলনের নীচে স্থান দিয়ে তাকে সংগ্রামের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, তা না করলে মারাত্মক ভুল করা হবে।

বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ করা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের পার্টির ভুল ধারণা তিনি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যাতে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণ করার কাজ বর্জন না করে, তার জন্য লেনিন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কর্তব্য নির্ধারণের সময় লিখেছিলেন :

["কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এবং তা হবে ব্যতিক্রম] কোনো অবস্থায়ই পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা ও কাজকে এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমস্ত 'স্বাধীনতাকে' ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা চলবে না, সেগুলিকে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের উপজাত হিসাবেই শুধু দেখতে হবে।" [সিলেকটেড ওয়ার্কস, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৪৫]।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় অধিবেশনে পার্লামেণ্টারি কাজের গুরুত্ব বিশেষ করে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি তখন তাদের দেশের বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। লেনিন তাদের ভুল সংশোধন করবার জন্য অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কাছে তখন যে চিঠি লেখেন তাতে কেন কমিউনিস্ট পার্টি বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণ করবে, সেখানে পার্টি সদস্যদের কাজ কী হবে, সে কাজ কিভাবে সুসম্পন্ন করতে হবে ইত্যাদি খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। সেই চিঠিতে লেনিন লিখেছিলেন : "বুর্জোয়া পার্লামেণ্টকে ভেঙ্গে দেবার শক্তির অভাব যতদিন আমাদের থাকবে ততদিন এই পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধেই আমাদের কাজ করতে হবে বাইরে থেকে এবং ভিতর থেকে। শ্রমিকদের প্রতারিত করার জন্য বুর্জোয়ারা যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক হাতিয়ার ব্যবহার করছে, সেই হাতিয়ার সম্পর্কে মেহনতী জনগণের [শুধু প্রলেতারিয়েতের নয়, আধা প্রলেতারিয়েত ও ছোট কৃষকদেরও] বেশ উল্লেখযোগ্য অংশের যতদিন পর্যন্ত আস্থা থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই প্রতা-রণাকে ব্যাখ্যা করতে হবে সেই প্ল্যাটফরম থেকেই যে প্ল্যাটফরমকে শ্রমিকদের এবং বিশেষ করে অ-শ্রমিক মেহনতী জনগণের পশ্চাৎপদ অংশগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ বলে মনে করে থাকে।

"যতদিন আমরা কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে সক্ষম না হবো এবং সেই রকম নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম না হবো যে নির্বাচনে কেবলমাত্র

মেহনতী জনগণ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের সোভিয়েতের পক্ষে ভোট দেবে, যতদিন বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতেই রাষ্ট্রক্ষমতা থাকবে এবং বুর্জোয়া-শ্রেণী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার জন্য জনসংখ্যার বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের নিকট আহ্বান জানাবে, ততদিন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত মেহনতী জনগণের মধ্যে এবং কেবলমাত্র প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নয়—প্রচারাভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। যতদিন বুর্জোয়া পার্লামেন্ট শ্রমিকদের প্রতারিত করার হাতিয়ার হিসাবে থাকছে, যতদিন 'গণতন্ত্র' সম্পর্কে গালভরা বুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে আর্থিক প্রতারণা, ও সর্বরকমের ঘুষ প্রথাকে আড়াল করে রাখার জন্য, [বুর্জোয়া পার্লামেন্টে লেখকদের, ডেপুটিদের, আইনজীবীদের এবং অন্যান্যদের 'ঘুষ' দিয়ে কিনে নেবার জন্য যে রকম 'অতিসূক্ষ্ম' ব্যবস্থা বুর্জোয়ারা অবলম্বন করে থাকে সে-রকম আর কোথাও দেখা যায় না], ততদিন আমাদের কমিউনিস্ট হিসাবে কর্তব্য হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করা এবং অবিচলিতভাবে এই প্রতারণার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দেওয়া।" (রচনাবলী ৩১শ খণ্ড, পৃঃ ২৪২-২৪৬)

শুধু অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্টদের নয়, জার্মান "বামপন্থী কমিউনিস্টদের" এবং "বামপন্থী ডাচ কমিউনিস্টদের" ভুল দেখিয়ে দিয়ে লেনিন তাঁর "বামপন্থী কমিউনিজম—শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা" গ্রন্থে "বুর্জোয়া পার্লামেন্টে কি আমাদের অংশগ্রহণ করা উচিত" শীর্ষক একটি অধ্যায়ও সংযোজিত করেছিলেন। এই অধ্যায়ে তিনি ওদের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে এ কথাই প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, বুর্জোয়া পার্লামেন্টে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত এবং এ কাজ কমিউনিস্টদের করতেই হবে। সেদিন "জার্মান বামপন্থী কমিউনিস্টরা" নির্বাচন বয়কট করারই স্লোগান দিয়েছিল, বুর্জোয়া পার্লামেন্টে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের তারা বিরোধিতা করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য করেই লেনিন লিখে-ছেন ঃ "সুনির্দিষ্টভাবে নিজেদের শ্রেণীর পশ্চাৎপদ অংশকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে অনুন্নত, পদদলিত অজ্ঞ কৃষক জনগণকে জ্ঞানের আলোকে জাগ্রত করার জন্য পার্লামেন্টারি নির্বাচনে এবং পার্লামেন্টের মধ্যে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টির পক্ষে বাধ্যতামূলক। বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে এবং অন্যান্য ধরনের প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতি-ষ্ঠানকে যতদিন পর্যন্ত আপনারা লুপ্ত করে দিতে না পারছেন ততদিন এগুলির ভিতরে আপনাদের কাজ করতে হবে—এ কাজ করতে হবে এই জন্যই যে, ঐগুলিতে এখনো শ্রমিকেরা রয়েছে, যাদের যাজকেরা হতচেতন করে রেখেছে, যারা গ্রাম্য জীবনের নিরানন্দময় আবহাওয়ায় হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছে ; এই কাজ করতে না পারলে আমাদের শুধু বাক্যবাগীশে পরিণত হবার বিপদ রয়েছে।"

লেনিনের এই শিক্ষাকে সংকীর্ণতাবাদীরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে অগ্রাহ্য ক'রে চলেছে; তারা পার্লামেণ্টারি কাজকে বলে সংশোধনবাদী ও নয়াসংশোধনবাদী কাজ। শুধু এই নয়, শ্রেণীসংগঠন ও গণসংগঠন গড়ে তোলাকে তারা শ্রমের অপচয় বলেই মনে করে। বিপ্লব পরিচালনার জন্য লেনিন যে শক্তিশালী বিপ্লবী পার্টি গড়ার কথা বারবার বলেছেন সে কথায় কর্ণপাত করার সময় তাদের নেই। দেশে শ্রমিক কৃষককে কিভাবে সংগঠিত করা হবে, তাদের রাজনৈতিক চেতনা বর্তমানে কোন্ স্তরে রয়েছে, কৃষকদের বর্তমান অবস্থা কী, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্থাপনের প্রচেষ্টা কতদূর সার্থক হয়েছে, কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচী জনগণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে কিনা এবং সেই কর্মসূচীর ভিত্তিতে কৃষকদের সংগঠিত করা হয়েছে কিনা, সর্বোপরি বিপ্লবের নেতৃত্ব যারা গ্রহণ করবে শ্রমিকশ্রেণীর সেই বিপ্লবী পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি যথাযথভাবে সংগঠিত হয়েছে কিনা—এসব পর্যালোচনা করার কোনো প্রয়োজনই তারা মনে করে না। এই হচ্ছে আমাদের দেশে সংকীর্ণতাবাদীদের, নকশালপন্থীদের চেহারা। বন্দুকের নল আর কয়েকজন বাছাই করা পেটিবুর্জোয়া কর্মী—এই হচ্ছে তাদের বিপ্লবের হাতিয়ার। অবশ্য সাম্প্রতিককালে তারা পার্টি গড়ার কথা বলছে এবং পার্টির একটা নামও তারা ঘোষণা করেছে, কিন্তু তাদের চিন্তাধারা এতই বিক্ষিপ্ত যে, পার্টি গড়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা মাঝে মাঝে 'শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের কথা বলে থাকে কিন্তু তাদের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের মানে হলো কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিচালিত' গুটিকয়েক বিপ্লবীর নেতৃত্ব। আর তাদের কাছে 'শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিচালিত' কথার মানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও দেশের বাস্তব অবস্থায় তা প্রয়োগে সক্ষম এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত কর্মীদের নিয়ে গঠিত সুশৃংখল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি নয়; তাদের মতে এর অর্থ হলো মূলতঃ কমরেড মাও সে তুঙের কোটেশনের লালবই হাতে করা ভাবপ্রবণ যুবকদের পার্টি। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এ কথাও বলছে যে, কৃষি বিপ্লব শুরু হবার আগে পার্টির প্রয়োজনও নেই—কৃষি বিপ্লব আপনা হতেই শুরু হয়ে যাবে এবং তার মধ্য দিয়েই পরে পার্টি তৈরী হবে। আসলে এরা ফরাসী বিপ্লবী অগস্তে ব্লাঙ্কিরই (১৮০৫—১৮৮১) শিষ্য। এরা হচ্ছে ব্লাঙ্কিপন্থী। লেনিনের কথায়ঃ "ব্লাঙ্কিপন্থীরা প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে নয়, বাছাই করা বুদ্ধিজীবী সংখ্যালঘুদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানবজাতিকে মজুরী-দাসত্ব থেকে মুক্ত করার আশা করতো।" নকশালপন্থীরাও সেই আশা করছে। এ হচ্ছে সংকীর্ণতাবাদেরই পুরানো রূপ।